তুলসামূলক ধর্মতত্ত্ব

ইসলামী উত্তরাধিকার

মুসা আল হাফিজ

মুসা আল হাফিজ

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব
ইসলামী উত্তরাধিকার

অনুলিখন
মাওলানা আরিফ বিল্লাহ

আমন্ত্রণ প্রকাশন

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব

ইসলামী উত্তরাধিকার

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

আমন্ত্রণ প্রকাশন

✆ ০১৯৭৭ ৩৭ ৭১ ৮৯

পরিবেশনায়

ইদরীসিয়া কুতুবখানা

মাদানীনগর মাদরাসা রোড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

✆ ০১৯০৪ ৪৭ ৭৮ ০৭

✆ ০১৯৭১ ৩৭ ৭১ ৮৯

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com - niyamahshop.com - wafilife.com

প্রচ্ছদ

আবুল ফাতাহ মুন্না

পৃষ্ঠাসজ্জা

মুহিব্বুল্লাহ মামুন

শুভেচ্ছা মূল্য

১[illegible]/- টাকা মাত্র

Tulonamulok Dhormo Tothho : Islami Uttharadhikar

By Musa Al Hafiz

Published by Amontron Prokashon

Email : amontronprokashon@gmail.com

https://facebook.com/amontronprokashon

Price : US 3$

প্রকাশকের কথা . . .

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ইসলামকে প্রথাসর্বস্ব ধর্মের সাথে তুলনা করা মানে প্রশান্ত মহাসাগরকে বুড়িগঙ্গার সাথে তুলনা করা। ইসলামী জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা পার্থিব ও পরকালীন সকল বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, নিজেদের আত্মবিস্মৃতি এবং পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে ভুলে গেছি নিজেদের আত্মপরিচয়, সোনালি অতীত ও গৌরব।

"তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব" (কম্পারেটিভ রিলিজিওন বা মুকারানাতুল আদয়ান) এটি ইসলামী জ্ঞানের একটি শাখা। এটি আমাদের হারানো সম্পদ।

মুসা আল হাফিজ একটি চেতনা, একটি বাতিঘর। যিনি হৃদয়ের দরদ দিয়ে বর্ণনা করেন মুসলিম উম্মাহর হারানো অতীত ও গৌরব। নির্ণয় করেন উম্মাহর হতাশা ও দৈন্যতার কারণ। স্বপ্ন দেখান ভবিষ্যতের আশা ও প্রত্যাশা রিনির্মাণে। তাঁর কয়েকটি আলোচনার গ্রন্থনা এ বই।

আমন্ত্রণ প্রকাশন'র এটি প্রথম বই। সৌন্দর্য বর্ধনে সাধ্যনুযায়ী চেষ্টা করেছি। পাঠকের অভিযোগ ও পরামর্শ আমাদের পথচলা বেগবান করবে।

আমন্ত্রণ প্রকাশনের পক্ষে
আবু মুহাম্মাদ মামুনুর রশিদ

উৎসর্গ

এই বই পাঠে যে নিজের আত্মপরিচয়
ফিরে পাবে ...

সূচি

দ্বিমুখী অন্ধকার ০৯
বেদখল উত্তরাধিকার ১১
জ্ঞানগত ঐতিহ্য ও খণ্ডিত বর্তমান ১২
মহাবীরদের খামার, বীরত্বের ফসল ১৫
সত্যের দীক্ষা ও অগ্রসর নওমুসলিম ২৭
আধিপত্যের হাতবদল ৩১
কুরআনী ভাবধারা ৩৩
নববী কর্মধারার বিশেষ দিক ৩৫
বহুজাতিক দাওয়াত ও তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ৩৮
পরাভূত পরাশক্তি ৪৪
প্রশিক্ষিত দাঈদের কাফেলা ৪৭
আল-কুরআন ও ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক ৪৯
প্রজ্ঞাবান শ্রেণির খোরাক আলাদা ৬২
পরধর্মগ্রন্থ ও সত্যগোপন : প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ ৬৫
'তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো, তাওরাত ফয়সালা করবে' ৬৬
নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদল ৬৭
জ্ঞানভিত্তিক ও বাস্তবমুখী সংলাপ ৬৮
দাঈর জন্য আবশ্যক সত্যের প্রতি দৃঢ়প্রত্যয় ৬৮
সত্যের জন্য ক্ষুধার্ত মানুষ ও তাদের প্রতিক্রিয়া ৭১
নবীজীর সা. দরবারে বহুধর্মীয় পারস্পরিক বিতর্ক ৭২
চরিত্রের কাছে নাজরানবাসীর বশ্যতা স্বীকার ৭৩
মুশরিকদের সাথে ধর্মতাত্ত্বিক সংলাপ ও দাওয়াত ৭৪
'তোমার ধর্ম সম্বন্ধে আমি তোমার চেয়ে অধিক জানি' ৭৬
ধারণ করতে হবে এই আলো ৭৮

‘তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব : ইসলামী উত্তরাধিকার’ মূলত কবি দার্শনিক ও ইতিহাসবেত্তা উস্তাদ মাওলানা মুসা আল হাফিজের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি আলোচনার গ্রন্থিত রূপ। আলোচনা তিনটি বিগত ১৫ সেপ্টেম্বর, ২৭ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর ২০১৯-এ যথাক্রমে দা’ওয়াহ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের বিশেষ প্রশিক্ষণে, দাওয়াহ ইন্সস্টিটিউট মুগদা, মাণ্ডার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এবং মা’হাদুশ শায়খ ইদরীস আলইসলামীতে (মাদানীনগর, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ) আয়োজিত তরুণ আলেমদের উদ্দেশ্যে তিন মাস ব্যাপী ‘দাওয়াহ ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের প্রশিক্ষণ’ প্রোগ্রামে প্রদত্ত হয়। প্রতিটি আলোচনাই একটি আরেকটিকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে। ফলে তিনটি মিলিয়েই এই গ্রন্থনা। অডিও রেকর্ড থেকে গ্রন্থনা করেছেন মাওলানা আরিফ বিল্লাহ।

দ্বিমুখী অন্ধকার

একটি গল্প দিয়ে শুরু করি। গল্পটি অবশ্য আমারই। তিন বছর আগে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছিলাম। বিষয় ছিল 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব'। আমার এক অধ্যাপক বন্ধুকে বললাম, 'সময় হলে ওয়ার্কশপে আসবেন।' তিনি জানতে চান, 'বিষয় কী?'

বললাম, 'কম্পারেটিভ রিলিজিওন সম্পর্কিত।' জানতে চাইলেন, 'কোথায়?' বললাম, 'মাদরাসায়।' তিনি যেন অবাক হলেন, মাদরাসায় এমন আয়োজন!

বললাম, 'অবাক হচ্ছেন কেন? জ্ঞানের এ শাখাটি তো মাদরাসা থেকেই বেরিয়ে এসেছে।' তিনি বললেন, 'আপনি কৌতুক করেন ভালোই।'

তাঁকে বললাম, 'স্যার টমাস আর্নল্ড ও আলফ্রেড গিয়োম সম্পাদিত *'The Legacy of Islam'* বইটি পড়বেন। বইটিতে ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রয়েছে। এগুলো লেখেছেন পশ্চিমা দুনিয়ার সেরা পণ্ডিতবর্গ। যেমন জেবি ট্রেন্ড, আর্নেস্ট বার্কার, জে এইচ ক্রেমার্স, টমাস আর্নল্ড, এইচ আর গিব, আর এ নিকলসন প্রমূখ। আট নম্বর প্রবন্ধ হচ্ছে "দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব", লেখেছেন পশ্চিমা দুনিয়ার অন্যতম ধর্মতাত্ত্বিক, ওরিয়েন্টালিস্ট আলফ্রেড গিয়োম। এ প্রবন্ধে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন, ইউরোপের ইতিহাসে কম্পারেটিভ রিলিজিওনের ওপর সর্বপ্রথম বইটি লেখেন ইবনে হাযম। তিনি ইবনে হাযমকে 'বেয়াড়া পণ্ডিত' বলেছেন।

আবার এটা না বলে পারেননি যে, তিনিই ব্যাপকতামূলক *"তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞান"* এবং ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম ধারাবাহিক উচ্চাঙ্গের সমালোচনাগ্রন্থ লেখেন।

এর মানে, বাইবেলের ওল্ড ও নিউটেস্টামেন্ট নিয়ে তুলনামূলক উচ্চাঙ্গের আলোচনার প্রথম কৃতিত্বটা কোনো বাইবেল অনুসারীর নয়, খ্রিষ্টানের নয়, সেটা একজন 'বেয়াড়া' মুসলিম পণ্ডিতের। মুসলিমরা ইসলাম তো বটেই, অন্যসব ধর্মের আলোচনা-পর্যালোচনায়ও শিক্ষকের ভূমিকায় ছিলেন। যেমন ইবনে হাযম হলেন তুলনামূলক ধর্ম ও বাইবেলের উচ্চাঙ্গ আলোচনায়

ইউরোপের শিক্ষক এবং মজার বিষয় হলো, ইবনুল হাযম ছিলেন মাদরাসার ছাত্র, মাদরাসারই শিক্ষক।'

বন্ধুটি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বললাম, 'কম্পারেটিভ রিলিজিওন একান্তই মুসলিমদের আবিষ্কৃত একটি জ্ঞানশাস্ত্র।' তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি সাহসের সাথে দাবি করছেন?' বললাম, 'এ আমার কথা নয়। এটা বলেছেন বিখ্যাত *'রিনাসেন্স অব ইসলাম'*-এর লেখক সুইস বিশেষজ্ঞ এডাম মেজ (১৮৬৯-১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁর মতে মুসলিমরা কম্পারেটিভ রিলিজিওনের জন্মদাতা, বিকাশদাতা ও সমৃদ্ধিদাতা। মুসলিমরা এটাকে এতটা উৎকর্ষ দিয়েছিলেন যে, তা পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক কাঠামোর উপর স্থাপিত হয়।

অধ্যাপক বন্ধু যথেষ্ট পড়াশোনা করেন এবং সচেতন মানুষ। কিন্তু তিনি বললেন, 'বিষয়টি তো এভাবে শুনিনি, বরং আমি জানি এবং প্রায় সবাই জানে এটা ইউরোপে উদ্ভাবিত বিজ্ঞান।' তিনি প্রশ্ন করলেন, 'বিষয়টি যদি এমনই হয়, তাহলে দুনিয়ার মানুষ বিষয়টাকে ভিন্নভাবে কেন জানে?'

খুবই ওজনদার প্রশ্ন। আমি এ বিষয়টাকে আলোচনার ধারাবাহিকতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করবো।

অধ্যাপক বন্ধুর গল্পে একটা দিক এসেছে। আরেকটি দিকের উল্লেখ করি। যখন সেই ওয়ার্কশপে বিভিন্ন মাদরাসা থেকে তরুণ আলেমদের কেউ কেউ আসলেন। তাঁদের অনেকেই প্রশ্ন করলেন, এ বিষয়টার সাথে দ্বীনি ইলমের সম্পর্ক কী? একজন ছাত্রকে বড় এক মাদরাসার শিক্ষাসচিব ওয়ার্কশপে আসার কারণে শাস্তি দেন। কারণ, দ্বীনি ইলম অর্জনের দিক থেকে এই সব দুনিয়াবি ও বিজাতীয় বিষয়ের চর্চায় মারাত্মক ক্ষতি দেখা দেবে।

তাহলে দুই দিক থেকেই সমস্যা। ইসলামী শিক্ষাপ্রাপ্তদের বড় একটি অংশ, বলতে গেলে প্রধান অংশটি একে বিজাতীয় বিষয় তথা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বিষয় বলে ধরে নিয়েছেন। অপরদিকে পশ্চিমা শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রেণি এবং অমুসলিমরাও জানেন, এটা ইউরোপে জন্ম নেওয়া বিজ্ঞান। এই দুই শ্রেণি নানা বিষয়ে উল্টো অবস্থানে থাকেন। কিন্তু এ জায়গায় দারুণভাবে একই মতের অনুসারী। একই দাবি ও ধারণায় অটল।

বেদখল উত্তরাধিকার

আজ যদি আপনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেন যে, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব কোথা থেকে এসেছে? সে হয়তো বলবে, এটা নিয়ে সপ্তদশ শতকে গবেষণা করেছিলেন লর্ড হার্ভাট। দার্শনিক জন লক, ১৬৯২ সালে মৃত্যু হয় এই বরেণ্য দার্শনিকের। তিনি আলোচনা করেছেন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে। তিনি *'Latters on Toleration'* লেখেছিলেন। তিনি এ শাস্ত্রে প্রাথমিক চিন্তানায়কদের একজন।

তারপর হয়তো আরও শক্তিশালীভাবে বলবে প্রাচ্যবিদ ম্যাক্স মুলারের কথা। বলবে, তিনি *'Comparative Religions'*-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি *'Comparative Mithology'* লেখেছিলেন, যা প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ সালে। লেখেছিলেন *'Introduction to the Science of Religion'* নামক অনবদ্য গ্রন্থ। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে। তিনি ৫০ খণ্ডে *'The Sacred Books of the East'* লেখেছেন। সেখানে তিনি প্রাচ্যের সবগুলো ধর্মের বিবরণ দিয়েছেন। তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন। সে বলতে পারে এই বিজ্ঞান এসেছে জার্মানি থেকে, ইউরোপ থেকে। বলতে পারে এ বিজ্ঞানের অগ্রপথিক ই,বি, টেইলর। জেমস ফ্রেজারের কথাও বলতে পারে। বলতে পারে ম্যাবেটের কথা। কিংবা এডলফ বাস্টেন। যাঁরা নৃতাত্ত্বিক হয়েও ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করেছেন নিবিড়ভাবে।

এ ছাড়াও উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথকে দেখা হয় এ বিষয়ে অগ্রণী ব্যক্তিত্ব হিসেবে। এস্টলিন কার্পেন্টার অথবা জোয়াকিম ওয়াচ–এঁরাই এ শাস্ত্রের অগ্রপথিক। এঁদের মাতৃস্নেহে প্রতিপালিত হয়ে এ শাস্ত্র শৈশব, কৈশোর অতিক্রম করে এখন যুবক। ছাত্ররা এসব বলবে। বাংলাদেশের ছাত্র যেমন বলবে, তেমনি বলবে জাপান, কোরিয়া, মিসর, চিলি কিংবা জার্মানির একজন ছাত্র। বর্তমানে সারা বিশ্বের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ছাত্ররা এভাবেই জানেন। এটাই তাঁরা শিখেছেন, শুনেছেন, পড়েছেন।

এর অর্থ কী দাঁড়ালো? যে বিজ্ঞান প্রবর্তন করেছে মুসলিমরা, কিন্তু তা আর তাদের হাতে নেই। বেদখল হয়ে গেছে। আমাদের পূর্বপুরুষের অর্জিত সম্পদ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। ভুলেই গেছি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এই মহাদেশে আমাদের কত কত বিনিয়োগ ও অধিকার ছিল, কর্তৃত্ব ছিল।

সে যুগে মুসলিমদের এমন কোনো জামেয়া (বিশ্ববিদ্যালয়) ছিল না যেখানে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পঠন-পাঠন হতো না। বিখ্যাত মুস্তানসিরিয়া মাদরাসায় তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে তিনজন বিখ্যাত উস্তাদ ছিলেন। নেযামিয়া মাদরাসা, মরক্কোর কারাউন বিশ্ববিদ্যালয়, জামেয়া আল আযহার সব জায়গায় তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অপরিহার্য সাবজেক্ট ছিল।

যেসব বিশ্ববিদ্যালয় ইমাম গাজালী, ইবনে তাইমিয়া, আবদুল কাদের জিলানীর মতো ব্যক্তিত্ব তৈরি করলো, সেখানকার সিলেবাস, কারিকুলাম কি আমাদের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয় হতে পারে না? যে সিলেবাসে পাঠ লাভ করে গাজালী 'গাজালী' হলেন, ইবনে তাইমিয়া নিজেকে গড়ে তুললেন, ইযযুদ্দীন ইবনে আবদিস সালাম নিজেকে তৈরি করলেন, যে সিলেবাস থেকে জন্ম নিলেন তাফতাযানী, ফখরুদ্দীন রাযী... সে সিলেবাসে দেখবেন আমাদের পঠিত বিষয়ের চেয়ে অনেক অনেক অধিক বিষয়াবলি ছিল।

দেখবেন মৌলিক উলুমে ইসলামীর প্রচলিত বিষয়সমূহের পাশাপাশি গাজালী দর্শন পড়েছেন, জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়েছেন, রসায়ন পড়েছেন। ইবনে তাইমিয়া দর্শন পড়েছেন, ইতিহাস পড়েছেন, ভূগোল পড়েছেন, গণিত পড়েছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়েছেন। ফখরুদ্দীন রাযী পড়েছেন, জালালুদ্দীন রুমী পড়েছেন, ইমাম কুরতুবী পড়েছেন... রাযী হবার জন্য, রুমী হবার জন্য, কুরতুবী হবার জন্য তাঁদেরকে এগুলোও পড়তে হয়েছে। বিশেষভাবে পড়তে হয়েছে। আমরা তাঁদের নাম নিই, গর্ব করি তাঁদের নিয়ে, কিন্তু তাঁরা কী কী নিয়ে, কেমন ব্যাপক পাঠ ও প্রস্তুতি নিয়ে, আরও কতকিছু সাথে নিয়ে 'তাঁরা' হয়েছেন, সেটা দেখতেও চাই না।

এগুলো কুরআন-সুন্নাহ এবং দ্বীন ও মিল্লাতের প্রয়োজনেই তাঁদেরকে আত্মস্থ করতে হতো। সেই প্রয়োজনে তাঁরা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পাঠ নিয়েছেন, দিয়েছেন; তাঁদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে এটি ছিল অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা গবেষণা করেছেন এ নিয়ে। একে দিয়েছেন নতুন মাত্রা ও বিকাশ। তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক চরিত্রের আলোচনা হতো যেকোনো ধর্মীয় ও

জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে। একে অনিবার্য করে তুলেছিল স্বয়ং আল-কুরআন, আস-সুন্নাহ।

কারণ কুরআন মজিদে অন্যান্য ধর্মের আলোচনা রয়েছে, ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মপ্রবর্তকদের আলোচনা রয়েছে বিস্তর। ফলে কোনো জামেয়া একে এড়িয়ে যেতে পারতো না। গুরুত্ব না দিয়ে পারতো না। বড় বড় আলেমরা এ বিষয়ে নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য অনুসন্ধান করতেন। গবেষণামূলক রচনা ও বক্তব্যের ধারাও ছিল প্রবাহিত।

আমরা যদি মনে করি ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত দারুল উলুম দেওবন্দ আমাদের শুরু এবং সেটাই আমাদের শেষ, তাহলে কীভাবে হবে। আল্লামা তকী উসমানী বলেছেন, 'দারুল উলুম দেওবন্দ একটি জরুরি পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে তার নেসাব প্রবর্তন করেছিল।' নেসাব প্রবর্তন করার সময় এটা বলা হয়নি যে, এটা চিরস্থায়ী। মাদানী রহ. যে নেসাব প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল যে, দুই বছর পর পর এর সংস্কার ও নবায়ন করা হবে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. কোথা থেকে তৈরি হয়েছিলেন? দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে? তখন তো দেওবন্দ মাদরাসা হয়নি। দারুল উলুম দেওবন্দ হলো শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ.-এর চিন্তার একটি স্ফুলিঙ্গের নাম। তাঁর চিন্তাধারার আলোকে এটা গড়ে ওঠেছে। ওয়ালীউল্লাহ খান্দানে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ছিল অনিবার্য পাঠ্য।

থানভী রহ. সূত্রে রচিত *'আল-ইফাদাতুল ইয়াওমিয়্যাহ'* দেখুন। সেখানে আছে শাহ আবদুল কাদির দেহলভী রহ. সংক্রান্ত এক কাহিনি। এক পাদ্রী দিল্লি এসে ওয়ালীউল্লাহ খান্দানের কোনো আলেমকে হারাবার আগ্রহ দেখালো। এ খান্দানের লজ্জিত মুখ যারা দেখতে চায়, তারা বললো, তুমি আবদুল কাদির দেহলভীর সাথে তর্ক করবে। কারণ তিনি খান্দানের মধ্যে সবচেয়ে কম বাকপটু। পাদ্রী যখন তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত হলো, তিনি তাঁকে লা-জওয়াব করে দিলেন। আর বললেন, 'শোনো, ওয়ালীউল্লাহ খান্দানে তরজমায়ে কুরআন পড়াবার আগে বা সাথে সাথে বাইবেল পড়ানো হয়।' খ্রিষ্টধর্মের বা অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামের তুলনামূলক জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব রহীমিয়া মাদরাসায় কত বেশি ছিল, এ থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়। এই রহীমিয়া মাদরাসা পরে কলেজ হয়ে গেল। ব্রিটিশরা তা করলো।

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবী রহ. কোথায় পড়েছিলেন? রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. কোথায় পড়েছিলেন? সেই কলেজে পড়েছিলেন? দিল্লি ইসলামীয়া কলেজে। উস্তাদ ছিলেন মামলুক আলী রহ.। এ কারণে তাঁকে 'উস্তাযুল-কুল' বলা হয়। দিল্লি ইসলামীয়া কলেজে ইসলামীয়্যাতের শিক্ষক ছিলেন মামলুক আলী রহ.। তাঁর অন্যতম ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন কাসেম নানুতুবী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ।

মামলুক আলী সৈয়দ আহমদ শহীদ রহ.-এর বালাকোট আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। বালাকোট আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর মামলুক আলী শিক্ষার দিকটাকে প্রাধান্য দিলেন। নতুন সৈনিক ও নতুন সংস্কারক, নতুন আলেম ও নতুন চেতনাদৃষ্টির মানুষ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে গেলেন। সেখানে পাঠ গ্রহণ করে কাসিম নানুতুবী রহ. হুজ্জাতুল ইসলাম হলেন। কীভাবে হলেন? তিনি খ্রিষ্ট ধর্মের পাদ্রী, হিন্দু ধর্মের পুরোহিত, বৌদ্ধ ধর্মের ভিক্ষু, আর্যসমাজের দিয়ানন্দ সরস্বতীসহ প্রতিটি প্রধান ধর্মের প্রতিনিধিদের ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কে পরাজিত করেছিলেন। সেটা করেছিলেন শাহজাহানপুর বাহাসে। সবাই আগ থেকেই জানতো বাহাসের আলোচ্য বিষয় কী। নানুতুবীকে জানানো হয়নি। উপস্থিত হয়ে জানলেন। কিন্তু তবুও সবাইকে হারিয়ে জয়ী হলেন। কত বেশি যোগ্যতা ছিল তাঁর এ বিষয়ে! কত বেশি ছিল পড়াশোনা!

আপনি কাসিম নানুতুবী হতে চান, তিনি যা পড়লেন, তা পড়তে চান না। ইবনে তাইমিয়া হতে চান। ইবনে তাইমিয়া দর্শন পড়েছেন। আপনি কি দর্শন পড়েছেন? তিনি উস্তাদের কাছে ইতিহাস পড়েছেন। আপনি কি পড়েছেন? বলবেন, এটা সিলেবাসে নেই। কিন্তু সিলেবাসে যা আছে, সেটাও আমরা ভালোভাবে আত্মস্থ করছি কি? সেটা আত্মস্থ করতে না পারলে বাইরেরটার দিকে হাত বাড়াবেন কীভাবে? আমরা সিলেবাস বদলাতে পারবো না। সেটা আপাতত আমাদের হাতে নেই। সে জন্য বিদ্যমান সিলেবাসের উপর সর্বোচ্চ যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি অন্যান্য অত্যাবশ্যক ও প্রয়োজনীয় শাখাগুলোর মধ্যে আমাদের বিকল্প উপায়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে।

যাই হোক, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের উপর প্রথম যে গ্রন্থটি আমরা পাই তা রচিত হয় খলীফা হারুনুর রশীদ রহ.-এর মাধ্যমে। এটা হিজরী দ্বিতীয় শতকের ঘটনা। খলীফা হারুনুর রশীদের ইন্তেকাল হয় ১৭০ হিজরীতে। তিনি বাইজেন্টাইন সম্রাট কনস্টানটিনের কাছে একটি চিঠি লেখেন। চিঠি ছিল ৩৩ পৃষ্ঠার। তার মধ্যে ছিল তিনটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে ইসলামের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে খ্রিষ্টবাদের দাবিগুলো খণ্ডন করেন। তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেন। এভাবে ধর্মগুলোর তুলনামূলক পর্যালোচনা করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার ঐতিহ্য লিখিত অবয়বে তৈরি হতে থাকে।

এই যে বিভিন্ন ধর্মকে পর্যালোচনা করা, এটাই হচ্ছে মুকারানাতুল আদইয়ান বা কম্পারেটিভ রিলিজিওন। এ হচ্ছে এমন এক বিজ্ঞান, যা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের কোন জায়গায় মৌলিক মিল আছে? কোথায় অমিল আছে? ধর্মের সাথে ধর্মের সম্পর্ক কেমন? এ সম্পর্কের মাত্রাটা কী রকম? সম্পর্কের নানা শাখা-প্রশাখা, উৎকৃষ্টতা-নিকৃষ্টতা যাচাই করে। ধর্মগুলোর উৎস নিয়ে কথা বলে, বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলে, বুনিয়াদ ও কাঠামো নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করে।

প্রতিটি ধর্মের লোকেরা চেয়েছে নিজের ধর্মের পক্ষপাতিত্ব করতে। অন্য ধর্মের বিপরীতে যেনতেন প্রকারে নিজের পক্ষ সমর্থন ছিল একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়টাকে বস্তুনিষ্ঠ এক রূপ দিয়েছে। তথ্য-প্রমাণের যথার্থতা, বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাভিত্তিক পর্যালোচনা, উপাত্তনির্ভর বিতর্ক ও সংলাপ এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

খলীফা হারুনুর রশীদের বক্তব্যের মধ্যে এর একটি চমৎকার নমুনা ছিল। শুধু খ্রিষ্টবাদ নিয়ে নয়, অন্যান্য ধর্ম নিয়েও মুসলিমরা তখনই আলোচনা শুরু করেছেন। হারুনুর রশীদের এক উজির ইয়াহইয়া ইবনে খালেদ বারমাকী (মৃত্যু : ১৯০ হিজরী) ভারতের ধর্মগুলোর ওপর একটি কিতাব লেখেন,

❖ "مذاهب الهند" (মাযাহিবুল হিন্দ)

সেখানে তিনি হিন্দুধর্মের যতগুলো শাখা-উপশাখা, ধর্মগ্রন্থগুলো, যেমন বেদ, গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির উপর পর্যালোচনা করেছেন। অথচ আরবে হিন্দুরা ছিল না। কিন্তু তখন মুসলিম সালতানাত যেহেতু ভারত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল, সেখানকার মানুষের জন্য, কিংবা দাঈদের জন্য, গবেষকদের জন্য অথবা মুসলিম শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি এটা লেখেছিলেন।

সে-যুগে মাজুসী বা অগ্নিপূজকরা ছিল সিরিয়ায়, ইরানে। আবু বকর আল-আসাম (মৃত্যু- ২০১ হি.) জরথ্রুস্টবাদের খণ্ডনে একটি কিতাব লেখেন,

❖ "الرد على المجوس" (আর রদ্দু আলাল মাজুস)

ইমাম শাফেয়ী রহ. যেমন ছিলেন ফিকহের ইমাম, তেমনি ছিলেন মুকারানাতুল আদইয়ানের ইমাম। তিনি হিন্দু ধর্মের বিশেষ একটি শাখা ব্রাহ্মণ্যবাদের পর্যালোচনায় এমন একটি কিতাব লেখেছেন যা তুলনাহীন। গ্রন্থটি হলো :

❖ "تصحيح النبوة والرد على البراهمة" (তাসহিহুন নবুওয়াহ ওয়ার রাদ্দু আলাল বারাহিমা)।

আপনাদের যদি ব্রাহ্মণ্যবাদ নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, অনেকেই হয়তো কিছু বলতে পারবেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদ আপনি যে সমাজে বসবাস করছেন, সেখানেই বিদ্যমান। অথচ ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদ ছিলো না। তাঁর মগ্নতা ছিল ইসলামী ফিকহের মতো জটিল বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদের ওপর কিতাব লেখেছেন। লেখেছেন দাঈদের জন্য। মুসলিম রাজনীতিবিদদের জন্য। যাঁরা ভারত শাসন করবেন, তাঁদের জন্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে, হিজরী প্রথম শতাব্দী শেষ হতে না হতেই খ্রিষ্টবাদ, হিন্দুবাদ, ইহুদিবাদ, জরথ্রুস্টবাদ এবং অন্যান্য ধর্ম নিয়ে মুসলিমদের তুলনামূলক জ্ঞানচর্চা শুরু হয়ে যায়।

মুহাম্মদ ইবনুল হুযাইল ইবনে উবাইদিল্লাহ আল বারী (মৃত্যু-২২৬ হি.) লেখেন,

❖ "الرد على اليهود" (আররাদ্দু আলাল ইয়াহুদ)। তিনি যৌক্তিকভাবে খণ্ডন করেন ইহুদিদের নানা বিশ্বাস ও ধর্মীয় বক্তব্য।

আবু উসমান আমর ইবনে বহর আয যাহিয (১৫৯-২৫৫ হি.) ছিলেন আরবী সাহিত্যের এক প্রবাধপুরুষ। তার আলোচিত কিছু বিখ্যাত গ্রন্থ তুলে ধরছি :

❖ "كتاب البخلاء" (কিতাবুল বুখালা)

❖ "التاج في أخلاق الملوك" (আততা-জু ফি আখলাকিল মুলূক)

❖ "كتاب الحيوان" (কিতাবুল হায়ওয়ান)

❖ "التبصرة بالتجارة" (আততাবসিরাহ বিত তিজারাহ)

কিন্তু এখন কম আলোচিত হলেও তার প্রধান একটি গ্রন্থ হচ্ছে—

❖ "المختار في الرد على النصارى" (আল মুখতার ফির রদ্দে আলান নাসারা)

যাতে তিনি খ্রিষ্টবাদ নিয়ে অসাধারণ পর্যালোচনা করেছেন। বাস্তবতা উন্মোচন করেছেন খ্রিষ্টীয় নানা দাবি ও ধারণার। ইহুদি ধর্ম সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থ:

❖ "الرد على اليهود" 'আর রাদ্দু আলাল ইয়াহুদ'।

আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আস সারাখসী (মৃত্যু-২৬৮ হি.) ছিলেন বহু বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি লেখেন,

❖ "رد النصاري" (রদ্দুন নাসারা) নামক গ্রন্থ। যাতে খ্রিষ্টবাদের তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও খণ্ডন রয়েছে। ইবনু আবিদ দুনিয়া আল কুরাইশী (মৃত্যু-২৮১ হি.) লেখেন,

❖ "الرهبان" (আর রুহবান)। যাতে খ্রিষ্টবাদের নিষ্ঠুর বৈরাগ্যবাদ ও যাজকতন্ত্রের অসারতা বিবৃত।

আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল আল বাসারী (মৃত্যু-৩৪৪ হি.) লেখেন দু'টি অসাধারণ গ্রন্থ :

❖ "الكلام على النصارى" (আল কালামু আলান নাসারা)

❖ "مذاهب النصاري" (মাযা-হিবুন নাসা-রা)

মুহাম্মদ ইবনে আব্দির রহমান আল মিসরী (মৃত্যু-৩৮০ হি.) লেখেন,

❖ "مقالات في الرد على اليهود" (মাকালাতুন ফির রদ্দে আলাল ইয়াহুদ)

আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ নিশাপুরী (মৃত্যু-৩৮১ হি.) লেখেন, ইসলামের তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক পর্যালোচনাধর্মী গ্রন্থ :

❖ "الإعلام بمناقب الإسلام" (আল ই'লামু বিমানাকিবিল ইসলাম)

অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের সাথে কম্পারেটিভ আলোচনা করে তিনি ইসলামের সৌন্দর্য তোলে ধরেন। এভাবে উদ্ভব হলো তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে বিরাট পণ্ডিতদের।

আবুল হাসান ইবনে মুসা আন-নাওবাখতি লিখলেন,

❖ "الرد على أصحاب التناسخ" (আর-রাদ্দু আলা আসহাবিত তানাসুখ)

এতে পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করেন তিনি। তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও মু'তাজিলী পণ্ডিত। ধর্মতত্ত্বে তিনি লেখেছিলেন বিশাল কলেবরের এক গ্রন্থ, যা প্রকাশিত হয় কিন্তু একসময়ে কপিগুলো হারিয়ে যায়। পরে আর খোঁজ মেলেনি। আজও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। কিতাবটির নাম–

❖ "الأراء والديانة" (আল-আ-রাউ ওয়াদ্দিয়ানা-ত)। ইবনে নদীমের ফিহরিস্তে বইটির উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে আরও বিবিধ সূত্রে।

আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী আল মাসঊদী লেখেন ধর্মতত্ত্বের অন্যতম ভীতগ্রন্থ :

❖ "المقالات في أصول الديانة" (আল-মাকালাত ফি উসূলিদ দিয়ানাত)

এবং আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ :

❖ "مروج الذهب ومعادن الجوهر" (মুরুযুয যাহাব ওয়া মায়াদিনুল জাওহার)

মুহাম্মদ ইবনে জাফর আল বাকিল্লানী লেখেন,

❖ "تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل" (তামহীদুল আওয়ায়ীল ওয়াতালখীসুদ দালায়ীল)

বাকিল্লানী ছিলেন ঐ সময়ে গোটা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় ধর্মতাত্ত্বিক পণ্ডিত ও বিতার্কিক। কোথাও খ্রিষ্টান বা নাস্তিকদের সাথে বিতর্ক সামনে এলে খলীফার পক্ষ থেকে তাঁকে পাঠানো হতো। কোনো বিতর্কের ময়দান থেকে তিনি পরাজয় নিয়ে ফেরেননি। বাকিল্লানীর ওফাত হয় ৪০৩ হিজরীতে।

তাঁরই সময়ের আরেকজন তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ আল মুসবেহী। তাঁর রচিত গ্রন্থ :

❖ "درك البغية في وصف الأديان والعبادات" (দারকুল বুগইয়া ফী ওয়াসফিল আদইয়ানি ওয়াল ইবাদাহ)

বইটি বিশ্বজুড়ে পঠিত হতে থাকে। তিনি ছিলেন কুর্দিস্তানের জ্ঞানীদের ইমাম। ৪২০ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। কাযী আবদুল জব্বার আল হামদানীর ইন্তেকাল হয় ৪১৫ হিজরীতে। তিনি লেখেন আর রাদ্দু আলান নাসারা গ্রন্থ।

বাগদাদে একই সময়ে ধর্মতত্ত্বের আলোচনা, বিতর্ক, সংলাপ ও রচনা-গবেষণায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন আবু মনসুর খতীবে বাগদাদী রহ.। বিভিন্ন জাতি, সভ্যতা ও ধর্ম নিয়ে তিনি লেখেন, 'আল মিলাল ওয়াননিহাল'। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন উপদলের তুলনামূলক আলোচনায় লেখেন,

❖ "الفرق بين الفرق" (আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক) ও

❖ "أصول الدين" (উসুলুদ্দীন)

দেখুন, তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে ৪২৯ হিজরীতে। ঠিক একই সময়ে মধ্য এশিয়ায় সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম মহাজ্ঞানী আল বেরুনী (প্রফেসর ম্যাকাও সাহেব তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী বলেছেন, জে.বি ট্রেন্ড বলেছেন, মুসলিমদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী, আমিও মনে করি, নবীদের পরে সম্ভবত তিনি ছিলেন গোটা মানবজাতির মধ্যে ব্যাপকতর জ্ঞানী।) জ্ঞানের অন্যান্য শাখার পাশাপাশি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে সোনার ফসল ফলাচ্ছে তাঁর রচিত গ্রন্থ :

❖ "كتاب الهند" (কিতাবুল হিন্দ) বাংলায় অনূদিত হয়েছে "ভারততত্ত্ব" নামে। এর চেয়ে ভালো বই রচিত হয়নি হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে। হিন্দুরাও পারেনি। তাঁর আরেকটি গ্রন্থ :

❖ "المقالات والآراء والديانات" (আল-মাকালাতু ওয়াল আরাউ ওয়াদ দিয়ানাত) ধর্ম ও ধর্মীয় চিন্তাধারা সমূহের উপর এক বেনজির গবেষণাকর্ম।

এই মনীষীর ইন্তেকাল হয় ৪৪০ হিজরীতে। তাঁরই জীবদ্দশায় আল্লামা জুওয়াইনী (মৃত্যু-৪৭৮হি.), যিনি ছিলেন ইমামূল হারামাইন, শাফেয়ী মাযহাবের অন্যতম আলেম, ইমাম গাজালীর উস্তাদ। তিনি লেখেন,

❖ "شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة و الإنجيل من التبديل" (শিফাউল গালী-ল, ফি বয়ানি মা ওয়াকায়া ফিততাওরা-তি ওয়াল ইঞ্জিল মিনাততাবদিল) গ্রন্থ।

একই সময়ে আন্দালুস ও উত্তর আফ্রিকায় ধর্মতাত্ত্বিক গবেষণায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন কম্পারেটিভ রিলিজিওন শাস্ত্রের জনক আবু মুহাম্মদ আলী ইবনে হাযম। তাঁর রচিত গ্রন্থ :

❖ "الفصل في الملل والأهواء والنحل" (আল-ফাসলু ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়াই ওয়াননিহাল)-এর মধ্যে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা যথার্থ অবয়ব পায়।

সেখানে পৃথিবীর সকল ধর্ম ও ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে উপাত্তভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়। এ কারণে তিনি যে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের জনক, এটা নিষ্ঠাবান ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন উচ্চকণ্ঠে। তাঁরা তাঁর সাথে যুক্ত করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম শাহরাস্তানীর নামও। লক্ষ করার বিষয় হলো, ইবনে হাযমের ওফাত হয় ৪৫৬ হিজরীতে। ইহুদিদের ধর্মীয় নেতা ও পণ্ডিত ইবনে নাগরিলাহ এর সাথে তিনি ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন। একে কেন্দ্র করে তিনি একটি প্রভাবশালী গ্রন্থ রচনা করেন :

❖ "الرد على اليهود" (আর রাদ্দু আলাল ইয়াহুদ)

এরপরে এ ময়দান খালি পড়ে থাকেনি। মহান মুজাদ্দিদ ইমাম গাজালী রহ. তাঁর অন্যসব বিষয়ের চর্চার পাশাপাশি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে রচনা, গবেষণা ও পাঠদান অব্যাহত রাখেন। তার রচিত গ্রন্থ হলো :

❖ "الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل" (আর-রাদ্দুল জামিল ফী উলাহিয়্যাতি ঈসা বি-সহিরিহিল ইঞ্জিল)। এ গ্রন্থে তিনি ইঞ্জিলের

পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেন, ইঞ্জিল বলছে, ঈসা আ. খোদা বা খোদার ছেলে কিংবা খোদার অংশ নন। তিনি শুধু আল্লাহর রাসূল।

৫০৫ হিজরীতে ইন্তেকাল হয় ইমাম গাজালীর। এর পরে বিপুল ব্যাপক শক্তি ও প্রতিভা নিয়ে এগিয়ে আসেন শাহরাস্তানী। তাঁর 'আল-মিলাল ওয়ান নিহাল' কম্পারেটিভ রিলিজিওনের স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থের অধ্যয়ন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এ শাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করতে শেখায়। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে বইটি ল্যাতিন ভাষায় অনূদিত হয়ে পশ্চিমা পণ্ডিতদের হাতে হাতে চলে যায়।

শাহরাস্তানীর ইন্তেকাল হয় ৫৪৮ হিজরীতে। সক্রিয় তখন তার ভাবশিষ্য মালেকী ফকিহ আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ওলীদ তারতূসী (মৃত্যু-৫৬০ হি.)। তারও কিছু গ্রন্থ রয়েছে। যেমন :

❖ "الرد على النصارى" (আর রাদ্দু আলান নাসারা)

❖ "السعود في الرد على اليهود" (আস সাঊদ ফির রদ্দে আলাল ইয়াহুদ)

সক্রিয় তখন কামালুদ্দীন ইবনুল আম্বারী। তিনি ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত ছিলেন, ছিলেন বড় সাহিত্যিক। কিন্তু সমান মাত্রায় তিনি ছিলেন ধর্মতত্ত্বের পণ্ডিত। তাঁর রচিত গ্রন্থ :

❖ "الداعي إلى الإسلام في أصول علم الكلام" (আদ-দাঈ ইলাল ইসলাম ফি উসুলি ইলমিল কালাম'।

৫৭৭ হিজরিতে তিনি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, তখন আবু উবায়দা আহমাদ ইবনে আবদুস সামাদ আল কুরতুবী (মৃত্যু-৫৮২ হি.) খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন সন্দেহের নিরসনে লেখেছেন,

❖ "مقامع هامات الصلبان" (মাকামিউ হামাতিস সুলবান) গ্রন্থ। তখন এ শাখায় সূর্যের মতো আলো ছড়াচ্ছেন ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ.। তাঁর রচিত আরেকটি গ্রন্থ রয়েছে। বইটির নাম :

❖ "إعتقاد فرق المسلمين والمشركين" (ইতিকাদাতু ফিরাকিল মুসলিমীনা ওয়াল মুশরিকীন)। গ্রন্থটি এ বিষয়ে অত্যন্ত সারগর্ভ। তিনি এ বিষয়ে পড়িয়েছেন, বিতর্ক করেছেন, প্রণোদনা ছড়িয়েছেন, গবেষক তৈরি করেছেন,

করেছেন গবেষণাকর্ম। তাঁর ইন্তেকাল হয় ৬০৬ হিজরীতে। তখন এ শাস্ত্রে গবেষণায় রত আছেন বিখ্যাত জীবনীকার আবু মুহাম্মদ আবদুল কাদির রাওয়ায়ী (মৃত্যু-৬১২ হি.) লেখেছেন,

❖ "الرد على النصارى" (আর রাদ্দু আলান নাসারা)। তখন সক্রিয় আছেন মুওয়াফফাকুদ্দীন আবদুল লতিফ ইবনে ইউসুফ (মৃত্যু-৬২৯ হি.) তিনি ছিলেন ফকীহ, ডাক্তার ও ইতিহাসবিদ। সমানমাত্রায় তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক। তিনি লেখেন,

❖ "مقالة في الرد على اليهود والنصارى" (মাকালাহ ফির রদ্দে আলাল ইয়াহূদী ওয়ন নাসারাহ) নামক গ্রন্থ। এ সময়ে এগিয়ে আসেন জামালুদ্দীন আবুল হাসান শাইবানী (মৃত্যু-৬৪৬ হি.) লেখেন,

❖ "الرد على النصارى" (আর রাদ্দু আলান নাসারা)। এগিয়ে আসেন মহান দাঈ, হানাফী ফকীহ নাজমুদ্দীন মুখতার জাহেদী (মৃত্যু-৬৫৮হি.) তিনি লেখেন যথাক্রমে :

❖ "الرسالة النصرانية" (আর-রিসালাতুন নাসরানিয়্যাহ)

❖ "رسالة في المناظرة بين المسلمين والنصارى" (রিসালাতুন ফিল মুনাযিরাতি বাইনাল মুসলিমী-না ওয়ন নাসারা)

❖ "رسالة في ذكر المخالفين" (রিসালাতুন ফি যিকরিল মুখালিফিন)।

এই মহান দাঈর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন মোঙ্গল শাসক বারকে খান। এ সময়ে তুলনামূলক ধর্মচর্চায় ভূমিকা রাখেন কাযী সালেহ ইবনে হুসাইন হাশেমী (মৃত্যু-৬৬৮হি.) তিনি লেখেন,

❖ "تخليج من حرف التوراة الإنجيل" (তাখলিজু মান হাররাফাত তাওরা-তা ওয়াল ইঞ্জিল)।

❖ "بيان الواضح المشهود من فضائح النصارى و اليهود" (আল বয়ানুল ওয়াযিহুল মাশহুদ মিন ফাযায়িহিন নাসারা ওয়াল ইয়াহুদ)।

❖ "الرد على النصارى" (আর রাদ্দু আলান নাসারা) নামক তিনটি গ্রন্থ।

এ শাস্ত্রে তখন মজবুতভাবে সক্রিয় ছিলেন মহান মুফাসসির মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর কুরতুবী (মৃত্যু-৬৭১ হি.) তিনি লেখেন,

❖ "الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام" (আল ই'লাম বিমা ফি দ্বিনীন নাসারা মিনাল ফাসাদি ওয়াল আওহাম) নামক গ্রন্থ। এগিয়ে আসেন ইমাম আবুল ফজল আব্বাস ইবনে মনসুর আস-সাক্কাকী। তাঁর রচিত গ্রন্থ :

❖ "البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان" (আল-বুরহান ফী মারিফাতি আকাইদি আহলিল আদইয়ান)।

একটি অনবদ্য রচনা। তাঁর ইন্তেকাল হয় ৬৮৩ হিজরীতে। শিহাবুদ্দীন আহমদ আল কারাখী (মৃত্যু-৬৮৪ হি.) লেখেন,

❖ "الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة" (আল আজওয়িবাতুল ফাখিরাহ ফির রদ্দে আলাল আসয়িলাতিল ফাজিরাহ)

❖ "أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية" (আদিল্লাতুল ওয়াহদানিয়্যাহ) এর মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

হানাফী ফকিহ ও অলংকারবিদ মুজাফফরুদ্দীন আহমদ ইবনে আলী এ সময়ে রচনা করেন ইহুদি ধর্মতত্ত্ববীদ ও দার্শনিকদের পর্যালোচনামূলক গ্রন্থ :

❖ "الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود" (আদদুররুল মানদূদ ফির রাদ্দি আলা ফাইলাসূফিল ইয়াহুদ)। তাঁর ইন্তিকাল হয় ৬৯৪ হিজরীতে।

কাসিদাতুল বুরদার রচয়িতা মহান কবি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ আল বুসিরী লেখেন,

❖ "منظومات في رد على اليهود والنصارى" (মানজুমাতুন ফির রদ্দি আলাল ইয়াহূদি ওয়ান নাসা-রা) নামক গ্রন্থ।

তাঁর ইন্তেকাল হয় ৬৯৪ হিজরীতে। একই বছরে ইন্তেকাল করেন শাফেয়ী ফকিহ ও সুফি আবদুল আজিজ ইবনে আহমদ আদ দীরীনী। তাওহিদের প্রামাণ্যতা ও খ্রিষ্টবাদের খণ্ডনে তিনি লেখেন-

❖ "إرشاد الحيارى" - (ইরশাদুল হায়ারা) নামক কিতাব।

এরপর এ শাস্ত্রের পতাকা উড়ান ইবনে তাইমিয়া রহ.। তিনি ফকীহ ছিলেন, মুহাদ্দিস ছিলেন, মুতাকাল্লিম ছিলেন, দার্শনিক ছিলেন। সমান মাত্রায় তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ :

❖ "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" (আলজওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দ্বীনাল মাসীহ) খ্রিষ্টধর্ম পর্যালোচনার এক অসাধারণ গ্রন্থ।

সাইপ্রাসের পল নামক এক পাদ্রী এবং এন্টিওকের সাইদার এক যাজক মিলে লেখেন এক বই। দাবি করেন খ্রিষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব। জবাবে ইবনে তাইমিয়া লেখেন তাঁর বইটি। শত শত বছর ধরে খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের জন্য বইটি একটি চ্যালেঞ্চ হিসেবে ভূমিকা রাখছে। এভাবে দীর্ঘ ধারাবাহিকতা দেখানো যাবে। মুসলিম মনীষীরা, উলামায়ে ইসলাম কীভাবে এ শাস্ত্রকে লালনপালন করেছেন, চর্চা করেছেন এবং গুরুত্ব দিয়েছেন। একে দ্বীনের প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছেন।

আমরা দেখবো এই সময়ে শাফেয়ী ফকিহ আলাউদ্দীন আলী ইবনে আবদুর রহমান আল বাযী (মৃত্যু-৭১৪ হি.) এর রচিত গ্রন্থ :

❖ "الرد على التوراة" (আররাদ্দু আলাত তাওরাত)

মালেকী ফকিহ আবদুল হক ইবনে সাঈদ মাগরেবী (মৃত্যু-৭৬১হি.) তিনি রচনা করেন :

❖ "الحصام المحدود في الرد على اليهود" (আল হুসামুল মাহদু-দ ফিররদ্দে আলাল ইয়াহূদ)

ইমাম যায়নুদ্দীন মারদিনী শাফেয়ীর (মৃত্যু-৭৮৮হি.) মতো মহাপণ্ডিত আলিম এগিয়ে আসেন এ শাস্ত্রে। লেখেন,

❖ "نهوض حثيث النهود إلى دحوض خبيث اليهود" (নুহূদু হাছিছিন নুহূদ ইলা দুহূসি খাবিসিল ইয়াহূদ) নামক গ্রন্থ।

এগিয়ে আসেন ইমাম আবু জাকারিয়া আর রাকিলী (মৃত্যু-৮২৫ হি.) লেখেন,

❖ "مجادلة مع اليهود والنصارى" (মুজাদালাতু মায়াল ইয়াহূদি ওয়ন নাসারা)

এগিয়ে আসেন ইমাম তাশকুবরা যাদাহ (মৃত্যু-৯৬৮হি.) এর মতো শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। লেখেন,

❖ "رسالة في الرد على اليهود" (রিসালাতুন ফির রদ্দে আলাল ইয়াহূদ)

এগিয়ে আসেন ইমাম শাওকানী (মৃত্যু-১২৫০হি.), স্পেনের ইহুদি পণ্ডিত মুসা ইবনে মায়মূনের মতামতের জবাবে লেখেন বিখ্যাত গ্রন্থ :

❖ "إرشاد الثقات" (ইরশাদুস সিকাত)

এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা প্রয়োজন যে, আমাদের আসলাফরা (পূর্ববর্তী মনীষীরা) বিভিন্ন ধর্মের ওপর কী কী কাজ করেছেন। আমরা দেখি, এ বিষয়ক আসলাফের বহু মূল্যবান গ্রন্থ আজ পর্যন্ত কোথাও খোঁজে পাওয়া যায়নি। এগুলোর বর্ণনা যদিও শক্তিশালী সূত্রে বিদ্যমান। আমার কাছে এর দীর্ঘ এক তালিকা আছে। সেখান থেকে কয়েকটি গ্রন্থের নাম শুনাচ্ছি। যেমন:

❖ العلاف كتاب على عمار البصري النصراني لأبي الهذيل

❖رد على النصارى لضرار بن عمرو المعتزلي

❖رد على النصارى لعيسى بن صبيح المردار

❖ رد على النصارى لحفص الفرد

❖كتاب على النصارى لأبي جعفر الإسكافي

❖كلام على النصارى للنظام المعتزلي

❖ كلام على في كتاب المعونة لأبي بكر أحمد بن علي بن الأخشاد

❖ الرسالة العسلية في الرد على النصارى للجاحظ

❖ الحجة على النصارى لمحمد بن سحنون المالكي

❖ رد حميد بن سعيد بن بختيار المتكلم على مَطران فارس المسمى يوشع بخت

❖ رد على النصارى للقحطبي.

❖ مناظرة ابن الطلاع القرطبي لنصراني من طليطلة

❖ إفحام النصارى لابن جزلة المتطبب

❖ رسالة ابن جزلة (أبو علي يحيى بن عيسى) كتبها إلى إليا القس

❖ قصيدة في الرد على نقفور فوقاس عظيم الروم للفقيه أبي الأصبغ عيسى بن موسى ابن عمر بن زروال الشعباني ثم الغرناطي

বিবরণ আর দীর্ঘ করে লাভ নেই। যাদের গ্রন্থের উল্লেখ করলাম, এরা সকলেই মুতাকাদ্দিমীন, প্রাচীনকালের লেখক এবং এরা প্রায় কাছাকাছি সময়ের। প্রায় সমসাময়িক এত লেখকের এত গ্রন্থ একই বিষয়ে রচিত হয়েছে এবং তা নিখোঁজ হয়েছে! এ থেকে অনুমান করতে পারেন, এ বিষয়ে কত কত লেখক কলম ধরেছেন এবং কত কত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল মুকারানাতুল আদইয়ান আমাদের কাছে অপরিচিত কোনো বিষয় হলেও এটা আমাদের পূর্বপুরুষদেরই উদ্ভাবিত বিজ্ঞান। হারানো সম্পদ। এটাকে অবলম্বন করে মুসলিমরা সারা বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করেছে।

এসব রচনার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন মুসলিম-অমুসলিম অনেকেই। অগ্রসর ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অনেকেই এসব পর্যালোচনা ও উদ্‌ঘাটনের খোঁজ-খবর রাখতেন। তাদের অনেকেই ধর্মান্তরিত হন। গ্রহণ করেন ইসলাম। আবুল হাসান আলী বিন সহল তাবারী (মৃত্যু-২৪৬ হি.) খ্রিষ্টান পাদ্রী। অনেকের মতে, তিনি যরথুস্টপন্থীদের ধর্মীয় নেতা ছিলেন। তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন এবং লেখেন,

❖ "الرد على أنصاف النصارى" (আর রাদ্দু আলা আনসাফিন নাসারা)।

খুবই পাণ্ডিত্যের সাথে তিনি খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতিটি ধারার পর্যালোচনা করেন। তবরিস্তানের মার্ভে জন্মগ্রহণকারী এ ধর্মতাত্ত্বিক পণ্ডিত ছিলেন সাহিত্যিক, দার্শনিক, চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ। তিনি বিখ্যাত ছিলেন মুয়াল্লিমুল আজিম বা মহিমান্বিত শিক্ষক নামে।

❖ "فردوس الحكمة" (ফিরদাউসুল হিকমাহ)

❖ "الدين والدولة" (আদদ্বীন ওয়াদ দাওলাহ)

❖ "حفظ الصحة" (হিফজুস সিহহাহ)

❖ "كتاب في تركيب الأرضية" (কিতাবু ফি তারকি-বিল আরদ্বিয়্যাহ) ইত্যাদি তার অনবদ্য গ্রন্থ।

ইবনু কাওসায়ীন (মৃত্যু-৩৬০) ছিলেন বিখ্যাত এক ইহুদি ধর্মবিশারদ। তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন এবং ইহুদিধর্মের নানা ভ্রান্তি নিয়ে লেখেন,

❖ "مقالة في الرد على اليهود" (মাকালাহ ফির রদ্দে আলাল আয়াহুদ)।

সামওয়াল ইবনে ইয়াহইয়া আল মাগরেবী (মৃত্যু-৫৭০হি.) ছিলেন ইহুদিধর্মের অন্যতম পণ্ডিত। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইহুদিধর্ম সম্পর্কে লেখেন,

❖ "إفهام اليهود" (ইফহা-মুল ইয়াহুদ) নামক গ্রন্থ।

আরেক ইহুদি পণ্ডিত ছিলেন আবদুস সালাম আল মুহতাদী। তিনি ইসলামে দীক্ষিত হয়ে ইহুদি ধর্মের নানা ভ্রান্তি খণ্ডনে লেখেন,

❖ "الرسالة الهادية في الرد على الماسونية" (আর-রিসালাতুল হাদিয়াহ ফির রাদ্দি আলাল মাসূনিয়্যাহ) নামক গ্রন্থ।

আবু আলী ইয়াহইয়া বিন ঈসা বাগদাদী (মৃত্যু-৪৯৩হি.) ছিলেন খ্রিষ্টান ধর্মনেতা। তার খ্যাতি ছিল একজন গবেষক ও ডাক্তার হিসেবে। তিনি মুসলিম হন এবং লেখেন,

❖ "الرد على النصارى" (আর রাদ্দু আলান নাসা-রা) গ্রন্থ।

নাশ্বার ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা আল মুতাতাব্বিব (মৃত্যু-৫৮৯হি.) ছিলেন বিখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিক, খ্রিষ্টধর্মের প্রচারক। তিনি দীক্ষিত হন ইসলামে। লেখেন,

❖ "النصيحة الايمانية في فضيحة الملة النصرانية" (আন নাসিহাতুল ঈমানিয়্যাহ ফি ফযীহাতিল মিল্লাতিন নাসরানিয়্যাহ) নামক গ্রন্থ, যা আজকের পৃথিবীতেও শ্রদ্ধার সাথে পঠিত হচ্ছে।

সাইদ ইবনে হাসান আল ইস্কান্দারী (মৃত্যু- ৭২০ হি.) ছিলেন খ্রিষ্টান ধর্মীয় পণ্ডিত, কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন ইহুদি। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং লেখেন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণ্য একটি বই-

❖ "مسالك النذر في نبوة سيد البشر" (মাসালিকুন নযর ফি নবুওওয়াতি সায়্যিদিল বাশার) গ্রন্থ।

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আত তারজুমান (মৃত্যু-৮৩২ হি.) ছিলেন খ্রিষ্টধর্মের তরজুমান বা ভাষ্যকার। তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন এবং খ্রিষ্টবাদের জবাবে লেখেন,

❖ "تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب" (তুহফাতুল আরীব ফিররদ্দে আলা আহলিস সালীব) গ্রন্থ।

ইয়াহইয়া আর রাসী ছিলেন হিজরী একাদশ শতকের উল্লেখযোগ্য এক এশীয় খ্রিষ্টান পাদ্রী। তিনি মুসলিম হন এবং লেখেন তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক অসাধারণ এক গ্রন্থ :

❖ "البحث الصريح في الدين الصحيح" (আল বাহসুস সারী-হ ফিদ দীনিস সাহীহ)।

আহমাদ ফারেস ইবনে ইউসুফ (মৃত্যু-১৩০৪হি.) লেবাননের মারুনী খ্রিষ্টানদের বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক ও অধ্যয়নের ফলে ইসলামে দীক্ষিত হন এবং লেখেন দুইটি অসাধারণ গ্রন্থ। একটি

❖ "محاكمة التأويل في مناقعة الإنجيل" (মুহাকামাতুত তা'বিল ফি মুনাকায়াতিল ইঞ্জিল)। অপরটি

❖ "التعليق على الأناجيل الأربعة" (তা'লিকুন আলাল আনাজিলিল আরবায়াহ)।

খ্রিষ্টান পাদ্রী ও পণ্ডিত উস্তাদ আবদুল আহাদ দাউদ চতুর্দশ শতকের প্রথম লগ্নে ইসলামে দীক্ষিত হন। খুবই উদ্দীপনা নিয়ে খ্রিষ্টবাদের সাথে বিতর্ক ও সংলাপে অবতীর্ণ হন। তার দুইটি বিখ্যাত গ্রন্থ :

❖ "الإنجيل والصليب" (আল ইঞ্জিলু ওয়াস সালীব)

❖ "محمد في كتاب المقدس" (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফি কিতাবিল মুকাদ্দাস)।

ইহুদি ধর্ম থেকে ইসলামে দীক্ষিত ইসরাইল ইবনে শামওয়ীল ইহুদিবাদ নিয়ে লেখেন উচ্চমার্গীয় কিছু রচনা। যার সংকলন হলো :

❖ "الرسالة السبعية بإبطال الديانات الهودية" (আর রিসালাতুস সাবয়িয়্যাহ বি ইবতালিদ দিয়ানাতিল ইয়াহুদিয়্যাহ)।

এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে বিস্তর। তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষিত, অগ্রসর, বোদ্ধা অমুসলিম শ্রেণিকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার

প্রক্রিয়া বরাবরই কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। পতনকালে এসে সেই ধারা অনেকটা স্থিমিত হয়। তবুও এমন ঘটনা এখনো ঘটে চলছে।

এই তো সেদিন ড. জিয়াউর রহমান আল আযমী লেখলেন অসাধারণ এক গ্রন্থ—

❖ "فصول في أديان الهند" (ফুসূলুন ফি আদঈয়ানিল হিন্দ)।

তিনি মূলত হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলামে আসেন। হয়ে উঠেন ধর্মতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর। লেখেন অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ। কিন্তু এরকম দৃষ্টান্ত আধুনিককালে অনেকটা কমে এসেছ। যদিও এ ধারার উপকারিতা অনস্বীকার্য। এ ধারায় মুসলিম জাহান লাভ করেছে আল্লামা আসাদকে, মার্মাডিউক পিকথলকে, মুরাদ হফম্যানকে, মরিয়াম জামিলাকে। তাঁরা একেকজন ছিলেন একেক প্রতিষ্ঠান। তাঁদের থেকে আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মানবতার বহু খেদমত নিয়েছেন।

অতীতে মুসলিম মনীষীরা অমুসলিম বুদ্ধিজীবী ও বিশেষজ্ঞদের সাথে, ধর্মীয় নেতাদের সাথে পরিকল্পিতভাবে জ্ঞানতাত্ত্বিক সংলাপ করতেন, বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন, দাঈ ও চিন্তাবিদ- আলেমদের প্রায় প্রত্যেকেই এ ধারায় কাজ করতেন। বিভিন্ন জামেয়া কাজ করতো। এখন পরিকল্পিত সেই মেধা আকর্ষণের ধারাকে আরও গতিশীল করা জরুরি। যে সুসন্তান হয়, সে পূর্বপুরুষদের হারানো সম্পদ উদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু একটা সময়ে এসে আমরা সম্পদকে ভুলে যাই। আসলে তখন আমরা আরও অনেক জরুরি বিষয়ও ভুলে যাই। এগিয়ে আসে ইউরোপীয়রা।

আধিপত্যের হাতবদল

ইউরোপীয়রা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে সুফল ভোগ করার জন্য ব্যাপক আয়োজন ও প্রস্তুতি নিয়েছিল। তাদের ভেতরে এ বিষয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গবেষক তৈরি হয়েছে। যেমন ম্যাক্স মুলারের কথা বললাম। কর্নেলিস পেট্রিস-এর 'এলিমেন্ট অব দি সাইন্স অব রিলিজিওন' ধর্মতত্ত্ববিষয়ক উচ্চমার্গীয় বক্তব্যের এক সমাহার। খ্রিষ্টান যাজক শ্রেণির মধ্য থেকে এগিয়ে আসেন অনেকেই। যেমন ব্যারন ভন হুগেল, ম্যাক্স শেলার, নাথান শোডারব্লম প্রমুখ। দার্শনিকদের মধ্যে এগিয়ে আসেন অনেকেই। যেমন ইমানুয়েল কান্ট, এমিল দুরখায়েম প্রমুখ। নানামাত্রিক পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের কথা বলা যায়। এস্টলিন কার্পেন্টারের কথা বলা যায়, লুইস হেনরি জর্দানের কথা বলা যায়, এ এ ম্যাকডোনালের কথা বলা যায়। এলবান জি উইজারি কিংবা জোয়াকিম ওয়াচের কথা বলা যায়। অনেকেই আছেন বিশ্ববিখ্যাত। এঁদের হয়ে ওঠা এবং বিচিত্র গবেষণার পেছনে প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্বধর্ম সম্মেলন হয়েছিল আমেরিকার শিকাগোতে। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ছিল ঐ সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়। ঐ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, খ্রিষ্টবাদ ও পশ্চিমা সভ্যতার স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। খ্রিষ্টজগতে এ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বকে হাতিয়ার বানানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল ১৮৯৩ সালে।

তারপর এমন কোনো শহর ছিল না, যেখানে তাঁরা এর চর্চায় লিপ্ত হননি। তাঁদের প্রতিটি রাজধানী ও গুরুত্বপূর্ণ শহরে এ নিয়ে বিচিত্র প্রণোদনা, ব্যাপক কর্মযজ্ঞ ও প্রস্তুতি বেড়ে চলে। আর আজ ২০১৯ সালে আমাদের মাঝে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। তাও আবার এটা রাজধানী শহর। হয়তো কেউ আবার এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারেন যে, এটা নিয়ে মগ্ন হলে দ্বীনি ইলমের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কারণ তাঁদের কাছে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব দ্বীনি ইলমের সংজ্ঞায় হয়তো পড়ে না। তাহলে আধুনিক আমলে এ শাস্ত্রে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের থেকে আমাদের চেতনাগত প্রস্তুতির ব্যবধান কত বছরের? ১৮৯৩ বনাম ২০১৯।

১৮৭৩ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব চর্চার প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়। ১৮৭৭ সালে আমাসটারডামে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়। লাইডেনে চালু হয়। ১৮৮৬ ফ্রান্সের সারবনে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠান হয়েছে। ১৯০৪ সালে ব্রিটেনের ম্যানচেস্টারে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের চর্চা ব্যাপক গতি পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়। পোপরা, খ্রিষ্টান পাদ্রীরা সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েছে। সেখানে তাদের সবচেয়ে মেধাবী সন্তানদেরকে পাঠানো হয়েছে। মিশনারি তৈরি করা হয়েছে। গির্জা ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সে-সবে অর্থায়ন করা হতো। ১৯১০ সালে জার্মানির বার্লিনে, ১৯১২ সালে লেপজিগে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের স্বতন্ত্র গবেষণাগার চালু হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ খোলা হয়েছে। কিন্তু মুসলিম জাহানে এখনও পযর্ন্ত তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের স্বতন্ত্র কোনো বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান আমরা তৈরি করতে পারিনি। জিতবে কারা?

আজকের পৃথিবীতে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে মানুষ তাকিয়ে থাকে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়, বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিকাগোর দিকে। কারণ সেখানে বর্তমান বিশ্বের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ইমামরা থাকেন। সেখানে খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা কেউ হয়তো ১০ হাজার হাদীস, কিংবা বুখারী শরীফ অথবা সমগ্র সিহাহ সিত্তা মুখস্থ করে বসে আছেন। হয়তো কেউ ইমাম শাফেয়ীর *'কিতাবুল উম্ম'*, ইমাম আবু হানিফার আকায়েদের কিতাব মুখস্থ করে বসে আছেন। কেউ ফিকহে বিশেষজ্ঞ, কেউ আকায়েদে বিশেষজ্ঞ। আকায়েদের উপর তাঁর ডক্টরেটই হয়তো চার পাঁচটি। এদের একেকটা অংশ পৃথিবীর একেকটা অংশে ছড়িয়ে পড়ছে। সুতরাং বর্তমান যুগের কোনো ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলে যদি সে বলে যে, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের উৎপত্তি ইউরোপে, এটা কি সে বাস্তবিক কারণে বলে নাকি অবাস্তব কারণে? তারা এটার জন্য বিরাট প্রস্তুতি শেষ করেছে। একটা দল রাত-দিন এটা নিয়েই নিমগ্ন রয়েছে।

মনে করুন, একজন কৃষিকাজ ভালোভাবে শিখেছে, আরেকজন ভালোভাবে শেখেনি। কার ফলন ভালো হবে? অথচ এখানে চাষাবাদের প্রেরণা ও শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে স্বয়ং কুরআন মজিদে।

কুরআনী ভাবধারা

আমি শুরুতে একখানা আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করেছি—

﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾[১]

এ আয়াতে অনেকগুলো বিষয় লক্ষণীয়।

﴿ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ ﴾

"হে কিতাবে বিশ্বাসী (ইহুদি-খ্রিষ্টানগণ) এসো!"

খুবই হৃদয়স্পর্শী দাওয়াত। যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হলো, এমন সম্বোধন যা তাদের জন্য সম্মানজনক, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে, আগ্রহী করবে, প্রণোদিত করবে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এসো! কীসের জন্য এ ডাক? কীসের প্রতি এ দাওয়াত? সেই দাওয়াত এমন এক বাক্যের প্রতি, মূলনীতির প্রতি যা,

﴿ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾

"তোমাদের আর আমাদের মধ্যে সমান।"

এ বাক্যের মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে।

﴿ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾

এটা হলো তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের সারকথা। কুরআনের একটি মাত্র বাক্য তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে সকল গ্রন্থ, সকল গবেষণা ও সকল পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ–সবকিছুর সারকথা বলে দিচ্ছে।

---

[১] সূরা আলে ইমরান : ৬৪

তুলনামূলক আলোচনা নিরপেক্ষ হবে, ইনসাফপূর্ণ হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিরপেক্ষ আলোচনা শেষ পর্যন্ত একটি সত্যে গিয়ে সমর্পিত হয়। একটি মোহনায় গিয়ে মিলিত হয়। যা সত্যকে উন্মোচিত করবে।

সেই সত্য, সেই মোহনার ঠিকানা আল্লাহ তাআলা বলছেন যে,

﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾

উভয়ের জন্য উভয়ের দিক থেকে সমান সেই বাক্য ও মূলনীতি হচ্ছে, আমরা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারও ইবাদত করবো না, তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করবো না, আল্লাহর বদলে নিজেদের মধ্যকার কাউকে প্রতিপালক বানাবো না। সহাবস্থানের একটি জায়গা এই আয়াত তৈরি করছে। ইহুদি ধর্ম, খ্রিষ্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম সবধর্মেরই মূলকথা ছিল যে, আল্লাহই একমাত্র মাবুদ; ঈশ্বর বলুন, গড বলুন, যেহুভা বলুন–তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই।

মুহাম্মদ সা. যদি কুরআনের লেখক হতেন, তাহলে এই আয়াত তিনি লেখতে পারতেন না। কারণ এই আয়াত লিখতে গেলে তাঁর পৃথিবীর বিশ্বাসবাদী সবগুলো ধর্মগ্রন্থের ব্যাপারে ধারণা থাকা দরকার ছিল। কিন্তু একজন নিরক্ষর মানুষের জন্য তৎকালীন পৃথিবীর বাস্তবতায়, যোগাযোগের সেই বাস্তবতায় সবগুলো ধর্মগ্রন্থের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব ছিল না।

বিশ্বাসবাদী সবধর্মগ্রন্থের মূলকথা তো সেটাই-আল্লাহ এক। কিন্তু সেই ধর্মগুলো কীভাবে বিকৃত হলো, কীভাবে তাতে বিভ্রান্তি দেখা দিলো, বিভ্রান্তিগুলোকে কীভাবে প্রমাণ করবেন, সত্যটাকে কীভাবে বের করে নিয়ে আসবেন? সেগুলোই তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পড়ার মধ্য দিয়ে আপনাকে করতে হবে। এজন্য শুধু পড়লে হবে না। আত্মস্থ করতে হবে।

নববী কর্মধারার বিশেষ দিক

৬ষ্ঠ হিজরী পর্যন্ত দাওয়াতী মেহনত একটি ধারায় চলছিল। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়া সন্ধি অনুষ্ঠিত হয়। হুদায়বিয়া সন্ধির সময় আল্লাহর রাসূলের সাথে ১৪শ সাহাবী ছিলেন। হিজরতের আগে মক্কায় তেরো বছর ও পরে মদিনায় ছয় বছর–মোট ১৯ বছর মেহনতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন ১৪শ সাহাবী। হুদাইবিয়ার সন্ধিতে যে চুক্তিগুলো ছিল, তা ছিল মুসলমানদের জন্য বাহ্যত পরাজয়ের। স্বাভাবিকভাবেই সাহাবীরা তা মেনে নিতে পারছিলেন না। এমনকি উমর রা. যিনি ছিলেন আল ফারিকু বাইনাল হক্কি ওয়াল বাতিল (সত্য ও মিথ্যায় পার্থক্য করার সহজাত ক্ষমতাসম্পন্ন), যিনি ছিলেন মেজাজে শরীয়ত, যার কথার সাথে সঙ্গতি রেখে কুরআন মজিদে আয়াত নাযিল হয়েছিল, সেই উমর রা.-ও এই শর্তাবলিকে অপমানজনক মনে করছিলেন। মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু প্রশান্ত চিত্তে তা ধারণ করতে পারছিলেন না। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে কিছু প্রশ্ন করেন, যে প্রশ্নের কারণে তিনি পরবর্তী সারা জীবন আফসোস করেছেন। কারণ চুক্তিগুলো ছিল সাহাবীদের জন্য সাধারণ বিচারে অপমানজনক। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেনে নিলেন সেই চুক্তি। উমর রা. এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি দ্বীনে হকের ওপর নেই? আপনি কি সত্য রাসূল নন? তাহলে আমরা এমন অপমানজনক চুক্তি কেন মানবো?' মদীনায় আসতে না আসতে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন,

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾

"নিশ্চয় আপনাকে দান করেছি সুস্পষ্ট বিজয়।"[২]

কাণ্ডজ্ঞান ও স্বাভাবিক বিচারে এটা ছিল সুস্পষ্ট পরাজয়। কিন্তু আল্লাহ এটাকে বললেন, সুস্পষ্ট বিজয়। যেই না আয়াত অবতীর্ণ হলো, সুহবতে নবীর প্রভাবে সাহাবায়ে কেরামকে সেটা বুঝতে কোনো বেগ পেতে হয়নি। মেনে নিতে বিন্দুমাত্র সমস্যা হয়নি। কিন্তু এটা কীভাবে ফাতহে মুবীন ছিল

---

[২] সুরা ফাতহ : ১

তা বাস্তবে উপলব্ধি করতে সাহাবীদের অনেক সময় লেগেছে। সবকিছু কি সাথে সাথে বুঝে ফেলা আবশ্যক? কিছু জিনিস যে ধীরে ধীরে বুঝতে হবে এটাও নববী তালিমের অংশ। হুদাইবিয়া সন্ধির দুই বছর পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় অভিযান চালালেন, তখন তাঁর সঙ্গীদের সংখ্যা দাঁড়ালো ১০ হাজার। কী এমন রহস্য ছিল। একদিকে ১৯ বছরের মেহনতের ফসল। আরেকদিকে দুই বছরের মেহনতের ফসল।

রহস্যটা কী ছিল? হুদাইবিয়া সন্ধির আগে মুসলিমদের প্রধানত তরবারির ভাষায় কথা বলতে হতো। কখনো ওয়াদিউল কুরায় অভিযান, কখনো হামরাউল আসাদে অভিযান, কখনো বনু কালব হামলা করে বসে সেই আতঙ্ক, বনু লিহইয়ান হামলা করে বসে সেই ভয়, বনু আসাদ হামলা করে বসে এই ভয়! মদীনার ভেতরে মুনাফিকদের ভয়, ইহুদি গোত্র বনু কায়নুকা, বনু নজীর, বনু কুরায়জার ভয়, প্রত্যেকেই করছে ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র। আঘাতের পর আঘাত। সবকিছুর কেন্দ্রে আছে কুরাইশরা। তারই উস্কে দিচ্ছে হামলাসমূহকে। কখন কে হামলা করে, কে হামলার ষড়যন্ত্র করছে এই পরিস্থিতিতে মুসলমানদের সারাক্ষণ প্রস্তুত থাকতে হতো। ঘুমের সময়ও তরবারি নিয়ে ঘুমাতে হতো। চতুর্দিকে শত্রু। আন্তরিকতার পরিবেশ, পারস্পরিক সহাবস্থানের পরিবেশ, চিন্তার আদান-প্রদানের পরিবেশ, হৃদয়ের ভাষায় কথা বলার পরিবেশ আরবে তখন ছিল না।

হুদাইবিয়া চুক্তি হলো। যেকোনোভাবেই যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই। সাহাবীদের মধ্যে আগে যাদেরকে সারাক্ষণ হাতে তরবারি ধারণ করে রাখতে হতো, তাঁরা এখন নতুন ব্যাপকতায় দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁরা কর্মে, বক্তব্যে, আখলাকে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরতে লাগলেন আরববাসীর কাছে। অধিকাংশ গোত্র মনে মনে ইসলামের কাছাকাছি চলে এলো। যে খালিদ বিন ওয়ালিদের কারণে উহুদের ময়দানে মুসলমানদের বিপর্যয় এসেছিল, যিনি কুরাইশদের সবচেয়ে শক্তিশালী তরবারি, যে আমর ইবনুল আসের কূটনৈতিক বুদ্ধি সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধ ছিল, যিনি মক্কার মস্তিস্ক, সেই খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ, সেই আমর ইবনুল আস ইসলামের ছায়াতলে চলে আসেন। আরবের লোকেরা দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিদায় হজের উদ্দেশ্যে

যাত্রা করেন তখন ময়দানে ছিলেন সোয়া লক্ষ সাহাবী। কিসের কারিশমায় এটা হলো? এটা ছিল দাওয়াতের কারিশমা।

যদি হুদায়বিয়া সন্ধি না হতো, যদি যুদ্ধ নয় শান্তি এই পরিস্থিতি তৈরি না হতো, যদি সহাবস্থানের পরিস্থিতি তৈরি না হতো, যদি পাশে যেয়ে তাদেরকে বোঝানোর পরিস্থিতি তৈরি না হতো, ঐতিহাসিকরা লেখেছেন, তাহলে মুসলমানদের বিজয়ের এই পরিস্থিতি তৈরি হতো কিনা সন্দেহ। হুদায়বিয়ার সন্ধির কারণে এই পথগুলো খুলে গিয়েছিল। তাহলে আমরা কী বুঝলাম? ইসলামী দাওয়াতের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ভালো, নাকি নৈরাজ্যপূর্ণ পরিবেশ ভালো? সংঘাত দাঈদের কাম্য নয়। দাঈদের মানসিকতা সংঘাতের নয়, শান্তির, সহাবস্থানের। অনেকে শুধু সংঘাতের জায়গাগুলো খুঁজে বের করে। সেটা নেতিবাচক মানসিকতা তৈরি করে। নেতিবাচক মানসিকতা নিয়ে দাঈরা এগুতে পারে না। দাঈদের কাজ তো শত্রুশিবিরেও বন্ধু খুঁজে নেওয়া। এভাবেই ইসলামের বিজয় হয়েছিল।

হুদাইবিয়া চুক্তিতে ছিল, আরবের গোত্রগুলো স্বেচ্ছায় মুসলিমদের সাথে অথবা কুরাইশদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে। আরবের দুটি গোত্র ছিল, বনু বকর ও বনু খুজাআ। এ গোত্র দুটি ছিল একে অপরের প্রতি সদা শত্রু ভাবাপন্ন। বনু বকর ছিল বড় গোত্র। বনু খুজাআ ছিল তুলনামূলক ছোট গোত্র। এই চুক্তি মোতাবেক বনু বকর কুরাইশদের সাথে এবং বনু খুজাআ মুসলিমদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। কেউ কারও উপর হামলা করতে পারবে না। প্রশ্ন দেখা দেবে, আল্লাহর রাসূল কীভাবে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে ফেললেন? কীভাবে চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন? এমন অনেকেই আছে, এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলে বসবে! বলবে, এটা আবার কেমন কাজ? যেন সে সাহাবাদের চেয়েও বেশি সমজদার!

যাই হোক। একদিন বনু বকরের লোকেরা বনু খুজাআর ওপর হামলা করলো। তাদের যুবক, বৃদ্ধ, নারী, শিশু–সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করলো। বনু খুজাআর কিছু লোক কাবার গিলাফের মধ্যে আশ্রয় নেওয়ার পরও সেখানে তাদের হত্যা করা হলো। কুরাইশদের ইন্ধনে বনু বকর এ আক্রমণ করে। বনু খুজাআর প্রতিনিধি আমর ইবনে সালেম খুজায়ী মদীনায় এসে আল্লাহর রাসূলের কাছে সাহায্যের ফরিয়াদ করলেন।

বনু খুজাআ কি তখন মুসলিম হয়ে গিয়েছিল? হয়নি। তারা মুসলমান হয়েছিল আরও পরে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল তাদের আবেদনে সাড়া দিলেন। মক্কায় সাথে সাথে দূত পাঠালেন। হয় বনু খুজাআর যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, অন্যথায় বলতে হবে হুদায়বিয়া সন্ধি চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে। কুরাইশদের একজন বললো, 'আমরা দ্বিতীয়টাই অবলম্বন করলাম।' আল্লাহর রাসূল যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। এখন কুরাইশদের টনক নড়লো। আবু সুফিয়ান চুক্তি বহাল করার জন্য মদীনায় এসে সবার দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলেন। কিন্তু কেউ পাত্তা দিলেন না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিযান পরিচালনা করে মক্কা বিজয় করলেন।

তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝলাম, হুদায়বিয়ার কারণে সৃষ্ট শান্তিপূর্ণ অবস্থাকে মুসলিমরা দাওয়াতের ক্ষেত্রে যেভাবে কাজে লাগিয়েছেন, ঠিক তেমনি রাজনৈতিকভাবেও কাজে লাগিয়েছিলেন। রাজনৈতিকভাবে কীভাবে কাজে লাগালেন? কুরাইশরা চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল। এ অভিযানে ন্যায্যতার ব্যাপারে তৎকালীন আরবের আইন অনুযায়ী এবং বর্তমান বিশ্বের আধুনিক আইন অনুযায়ী কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। এমনকি প্রাচ্যবিদরা, যাদের কাজই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভুল খুঁজে বের করা, তারা এক্ষেত্রে কোনো কথা বলতে পারেনি। তাদের কাছেও এ অভিযান ছিল একটি বৈধ অভিযান।

বহুজাতিক দাওয়াত ও তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়া সন্ধির পর ইসলামকে আন্তর্জাতিক বলয়ে ছড়িয়ে দিতে শুরু করলেন। তৎকালীন প্রধান পরাশক্তিদ্বয়, রোম ও পারস্যের দিকে নজর দিলেন। রোমের রাজাকে বলা হতো কায়সার আর পারস্যের রাজাকে বলা হতো কেসরা। তাদের কাছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিঠি প্রেরণ করলেন। দ্বীনের দাওয়াত সংবলিত চিঠি। এর আগে চিঠি পাঠিয়েছিলেন আসহামার কাছে। আসহামা কে? নাজ্জাশী। ইথিওপিয়ার শাসক। দেশটির তৎকালীন নাম ছিল হাবশা। খুব শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র ছিল। সমুদ্রপথে ভারত পর্যন্ত বাণিজ্য তারা নিয়ন্ত্রণ করতো। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, অভ্যন্তরীণ অবস্থা স্থিতিশীল ছিল। নাজ্জাশীর কাছে লেখা চিঠি কেমন ছিল?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ إِلَى النَّجَاشِيِّ عَظِيمِ الْحَبَشَةِ؛ أَسْلِمْ أَنْتَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رُوحُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْبَتُولِ الطَّيِّبَةِ الْحَصِينَةِ فَحَمَلَتْ بِعِيسَى فَخَلَقَهُ اللّٰهُ مِنْ رُوحِهِ وَنَفَخَهُ كَمَا خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ وَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى اللّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالْمُوَالَاةِ عَلَى طَاعَتِهِ وَأَنْ تَتَّبِعَنِي وَتُؤْمِنَ بِالَّذِي جَاءَنِي فَإِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ وَإِنِّي أَدْعُوكَ وَجُنُودَكَ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ بَلَّغْتُ وَنَصَحْتُ فَاقْبَلُوا نَصِيحَتِي وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى.

'পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে। মুহাম্মদের পক্ষ থেকে, যিনি আল্লাহর রাসূল, আবিসিনীয় অধিপতি নাজ্জাসীর প্রতি (এই পত্র প্রেরিত হচ্ছে)। হেদায়েত-অনুসারীদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আপনার নিকট সেই আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। যিনি রাজাধিরাজ, পবিত্র, শান্তিদাতা, মুমিন ও রক্ষক এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালাম আল্লাহর রূহ ও তাঁর বাক্য, যা তিনি পবিত্র আত্মা ও সতী-সাধ্বী মরিয়মের মধ্যে ফুঁকেছিলেন। এরপর তাঁর রূহ ও তাঁর ফুঁৎকারে ঈসা আ. তাঁর গর্ভে স্থিতি লাভ করেন। যেভাবে তিনি হযরত আদম আলাইহিস সালামকে বানিয়েছিলেন আপন কুদরতি হাতে। আমি আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি এক আল্লাহর বিশ্বাস স্থাপনে, যার কোনো শরীক নেই, তাঁর প্রভুত্বের, আনুগত্যের। আর আনুগত্য করুন আমার এবং ওহী হিসেবে আমি যা লাভ করেছি, বিশ্বাস স্থাপন করুন তার প্রতি। নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসূল আর আমি আল্লাহর দিকে ডাকছি আপনাকে, আপনার সেনাবাহিনীকে। আমি পৌঁছে দিলাম আপন পয়গাম, পূর্ণ করলাম নিজের নসীহত। অতএব আমার উপদেশ গ্রহণ করুন। যারা হেদায়েতের অনুসারী, তাদের প্রতি সালাম।'

এখানে "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" না বলে ঈসা আ.-এর কথা কেন বলা হলো? কারণ নাজ্জাশী তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি

রেসালাতেও ছিলেন বিশ্বাসী। কিন্তু রিসালাতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি ঈসা আ.-কেই যথার্থ মনে করতেন। ঈসা আ. অবশ্যই যথার্থ রাসূল। কিন্তু খ্রিষ্টবাদে বিকৃতির কারণে তাদের মধ্যে যে ভুল ধারণার তৈরি হয়েছে, সেটাকে যদি ভেঙে দেওয়া যায় তাহলে আসহামার মুসলিম হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকবে না। বাইবেলে ঈসা আ.-এর ব্যাপারে যে ধারণা পেশ করা হয়েছে, সেটাই চিঠিতে উল্লেখিত হলো। সেটা উল্লেখিত হয়েছে কুরআন মাজিদে–

﴿عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾

এটাই বাইবেলের যথার্থ ধারণা। বাইবেলের কোথাও কেউ দেখাতে পারবে না ঈসা আ. বলেছেন, 'তোমরা আমার উপসনা করো। আমি আল্লাহর অংশ।' হ্যাঁ, বাইবেলে ট্রিনিটির কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এরশাদ করেন, ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ﴾ এটা এমন একটি আয়াত, যেটা আসাহামার যে ধর্মতাত্ত্বিক মানসিকতা, তাকে দ্বীনের দিকে নিয়ে আসবে। হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ামের প্রতি সর্বোচ্চ যে সম্মান প্রদর্শন করা যায়, তা এখানে করা হয়েছে। ঈসা হচ্ছেন মরিয়মতনয়, তিনি রুহুল্লাহ ও আল্লাহর বাক্য, যাঁকে তিনি অবতরণ করিয়েছেন মরিয়মের প্রতি। খ্রিষ্টান মন এই সম্মানে প্রফুল্ল। আর যেহেতু শিক্ষিত এবং ধর্মগ্রন্থের সঠিক তথ্যে জ্ঞাত একজনকে তা বলা হচ্ছে, নিশ্চয় সে বুঝতে পারবে, যথার্থই প্রশংসা করা হয়েছে, ঈসা আ. আসলে যা, তাই বলা হয়েছে। একটি খ্রিষ্টান মন মরিয়মের বা মা মেরির প্রতিও শ্রদ্ধাশীল। তাঁর সম্পর্কেও তাঁর আকিদায় রয়েছে ভ্রান্তি, শ্রদ্ধায় রয়েছে বাড়াবাড়ি। অতএব তাঁর বিষয়টি আসছে উল্লেখে

﴿أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْبَتُولِ الطَّيِّبَةِ الْحَصِينَةِ فَحَمَلَتْ بِعِيسَى﴾

"ঈসা আ.-কে প্রেরণ করা হয় মরিয়ম আ.-এর উদরে, সর্বপ্রকার কলুষমুক্ত, নেককার, তিনি প্রসব করলেন ঈসাকে।"

আরেকটি গিঁট খোলা দরকার ছিল, যা খ্রিষ্টান মনকে গভীরভাবে বেঁধে রাখে। সেটা হচ্ছে, আল্লাহর সাথে ঈসা মসীহের সম্পর্ক। এটাই প্রধান গিঁট, একেও খুলে দেওয়া হলো। লেখা হলো–

﴿فَخَلَقَهُ اللهُ مِنْ رُوحِهِ وَنَفَخَهُ كَمَا خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ﴾

ঈসা আ.-এর সাথে আল্লাহর সম্পর্ক পিতা-পুত্রের নয়, বান্দা ও মাবুদের। স্রষ্টা ও সৃষ্টির। তিনি তাঁকে সৃষ্টি করেছেন আপন রূহ দ্বারা. আপন কুদরতি হাতে বানিয়েছেন, যেভাবে বানিয়েছিলেন আদম আ.-কে। তাহলে এটাও সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

এখানে আসহামার মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর রাসূল তাঁর প্রতি চিঠি লিখিয়েছেন। এখান থেকে কী শেখা গেল, একজন খ্রিষ্টানকে তার ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞান ও মানসিকতাকে বিচার করে তারপর দাওয়াত দিতে হবে। খ্রিষ্টবাদের মূল আকিদা আল্লাহ, ঈসা আ. এবং মরিয়মকে নিয়ে গঠিত। এতে যুক্ত আছে রূহুল কুদ্দুস-পবিত্র আত্মা। আল্লাহর সাথে ঈসা ও মরিয়মের সম্পর্ক। এটার ভিত্তিতে খ্রিষ্টানদের ভ্রান্ত ট্রিনিটি মতবাদ গড়ে উঠেছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিঠির প্রথম দুই লাইনে, খ্রিষ্টধর্মের আকিদা-ভিত্তিক ভ্রান্তি দূর করে আকিদাগত বাস্তব অবস্থান তুলে ধরেছেন। এখানে খ্রিষ্টবাদের বিরোধিতামূলক ভঙ্গিতে কোনো কথা বলা হয়নি। দাঈর কাজ বিরুদ্ধে বলা নয়। কিন্তু এমনভাবে বলা যে, বিরুদ্ধে বলার পরেও যা হবে না, তা তিনি অর্জন করে ফেলবেন। যদি এই চিঠির মধ্যে আসহামাকে এভাবে বলা হতো যে, আপনি খ্রিষ্টবাদ ত্যাগ করে মুসলিম হয়ে যান, তাহলে কি তিনি মুসলিম হয়ে যেতেন?

যাকে দাওয়াত দেওয়া হবে, তার বিবেচনাশক্তিকে, চিন্তাশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। যাকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে তার বিবেকবোধ, জ্ঞানগত পর্যায় বিবেচনায় রাখতে হবে। সবকিছু মাথায় রেখে এমনভাবে কথা বলতে হবে যে তার আকল, জ্ঞান, বুদ্ধি সবকিছু যেন আপনার পক্ষে চলে আসে। কিন্তু হুমকির ভাষায় সেটা হয় না। বিরুদ্ধে বলার দ্বারা তা হয় না। একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে এটা কিন্তু তার বিরুদ্ধেই বলা হলো। আসল হাকিকতটা তুলে ধরা হলো। আসল হাকিকত তুলে ধরা তো ভ্রান্তির বিরুদ্ধে বলা। এ কারণে দাওয়াহ সহজ কাজ নয়। মনকে তৈরি করে নিয়ে দাওয়াত পেশ করতে হয়। আসহামার মন তৈরি হয়ে যাবার জন্য যা বলার, তা বলা হয়ে গেছে। এখন সরাসরি দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে–

﴿إِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالْمُوَالَاةِ عَلَى طَاعَتِهِ وَأَنْ تَتْبَعَنِي وَتُؤْمِنَ بِالَّذِي جَاءَنِي﴾

"আমি আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি এক আল্লাহে বিশ্বাস স্থাপনে, যাঁর কোনো শরীক নেই, তাঁর প্রভুত্বের, আনুগত্যের। আর আনুগত্য করুন আমার এবং ওহী হিসেবে আমি যা লাভ করেছি, বিশ্বাস স্থাপন করুন তার প্রতি।"

কী দৃঢ় আর শীলিত আহ্বান! কী সাবলীল আর যথোচিত আহ্বান! যিনি তাওহীদে বিশ্বাসী, যিনি বিশ্বাস করেন রেসালাতে, তাঁর সামনে এর চেয়ে হৃদয়জ ও আকর্ষণীয় আহ্বান আর কী হতে পারে! কিন্তু এখানেই শেষ নয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত করলেন,

«قَدْ بَلَغْتُ وَنَصَحْت فَاقْبَلُوا نَصِيحَتِي»

'আমি পৌছে দিয়েছি আমার বার্তা, আমি শুভেচ্ছা ও শুভকামিতাপূর্ণ উপদেশ প্রদান করলাম। আপনি সাড়া দিন, গ্রহণ করুন এই শুভবাদী উপদেশ!' প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করলেন। আসহামা সাড়া দিলেন এই শুভেচ্ছার আহ্বানে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ধর্মতাত্ত্বিক বাক্যগুলো আসহামার মধ্যে এমনভাবে কাজ করলো, যেন প্রতিটি শব্দ আসহামার খ্রিষ্টান মনকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে দ্বীনের দিকে নিয়ে আসছিল। চিঠির একেকটি বাক্যে আসহামার মন পাড়ি দিচ্ছিলো শত বছরের পথ। বাক্যগুলো একটি স্রোতের মতো তাঁকে ভাসিয়ে নিলো। আসহামা মোহনায় উপনীত হলেন। জবাবি চিঠিতে তিনি লিখলেন,

«فما ذكرت من امر عيسى فورب السماء والأرض إن عيسى عليه السلام ما يزيد على ما ذكرت»

"ঈসা আ. সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন, আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের কসম করে বলছি, ঈসা আ.-এর চেয়ে বিন্দু পরিমাণ অধিক কিছু ছিলেন না।"

এবং চিঠির মধ্যেই আসহামা ঘোষণা দিলেন,

«أشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاً، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك»

'ঘোষণা করছি আপনি সত্যবাদী ও সত্যায়িত বা সত্যায়নকারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমি বায়আত করছি আপনার কাছে আর

আপনার চাচাতো ভাইয়ের কাছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতি মিশন কি জয়ী হলো না? এটাই তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনার সুফল।

যখন আসহামার দেশ আবিসিনিয়ায় মুসলমানরা হিজরত করেন, তখন তাঁরা ছিলেন অসহায় ও দুর্বল। তাঁদের সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য মক্কার সেরা কূটনীতিক আবদুল্লাহ বিন আবি রবীআ ও আমর ইবনুল আস সেখানে যান। তাঁরা গিয়ে আসহামাকে অনেক উপঢৌকন দেওয়ার পর বলেন, 'এই মুসলিমরা, যারা আপনার দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তারা নিজেদের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছে। এমনকি তারা ঈসার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না। আপনার ধর্মের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।'

মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল গুরুতর। আসহামা চাইলেই মুসলমানদের রেখে দিতে পারেন না। তার সভাসদ, উজির-নাজির, গির্জার পাদ্রীদের সমর্থন লাগবে। মুসলমানদের ডাকা হলো। কৈফিয়ত তলব করা হলো। নবীজির চাচাতো ভাই হযরত জাফর বিন আবু তালিব রা. এগিয়ে গেলেন এবং ইসলামের পরিচিতিমূলক ইতিহাসের সেরা বক্তব্যটি পেশ করলেন। সকল রাজনৈতিক, কূটনীতিবিদ ও ধর্মবেত্তাদের সামনে তিনি বক্তব্য রাখলেন। আইয়ামে জাহিলিয়াতের অবস্থা বর্ণনা করে ইসলাম তাদেরকে কী দিয়েছে তা বললেন। খ্রিষ্টবাদ সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান পরিষ্কার করলেন। তিনি সুরা মরিয়ম তেলাওয়াত করলেন। বক্তব্যের বিষয়বস্তুর প্রভাব এত বেশি ছিল যে দরবারের সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগলো। আসহামা কাঁদতে শুরু করলেন। এমনকি অশ্রুতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। তিনি বললেন, 'ঈসা আ.-এর সম্পর্কে ইসলামের যে বক্তব্য, তিনি এর চেয়ে বেশি কিছু নন।'

আল্লাহর নবী নিজের চিঠিতে যেমন তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক কৌশল অবলম্বন করেছেন, তেমনি এমন দাঈদের তৈরি করেছেন, যারা যেকোনো পর্যায়ের মানুষের সামনে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে সর্বোচ্চ প্রজ্ঞার সাথে দাওয়াত দিতে পারবেন। নববী তালিমের মধ্যে এটা ছিল। না-হয় জাফর রা. এটা কোথায় শিখলেন? কোন প্রতিষ্ঠান থেকে শিখলেন? তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল দারুল আরকাম, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম মাদরাসা।

পরাভূত পরাশক্তি

পরাক্রমশালী রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিঠি পাঠালেন হযরত দিহয়া কালবী রা.-এর মাধ্যমে। সেই চিঠিতে রাসূল কী লেখেছিলেন? লেখেছিলেন,

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. اما بعد فإنى أدعوك بدعاية الاسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم جميع الأريسيّين"، ﴿وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.

"পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে, মুহাম্মদের পক্ষ হতে, যিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, এই পত্র রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নামে (প্রেরিত হচ্ছে)। শান্তি নামুক হেদায়াতের অনুসারীদের ওপর। অতঃপর আপনাকে আমি আহ্বান করছি ইসলামের দিকে। ইসলাম কবুল করুন, শান্তি লাভ করবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করবেন। আর যদি তা না মানেন, এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে আপনার প্রজাদের পাপও আপনার ঘাড়ে চাপবে। "হে আহলে কিতাবীগণ! এসো এমন কথার দিকে, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমান। তা হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করবো না। আল্লাহকে বাদ দিয়ে কাউকে প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করবো না। আর যদি তোমরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলমান।"

অল্প কয়েক লাইনের চিঠি। হিরাক্লিয়াসের খ্রিষ্টান মন এতেই পরাভূত হয়ে যায়। এই চিঠির অন্তর্নিহিত শক্তি, চিঠির ভেতরকার তাৎপর্য ও আবেদন হিরাক্লিয়াসকে অবদমিত করেছিল। তিনি মুসলমান হবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। কিন্তু মুসলমান হওয়া তাঁর ভাগ্যে ছিল না।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসরের সম্রাট মুকাওকিসের কাছে চিঠি পাঠালেন হযরত হাতেব ইবনে আবি বালতায়া রা.-এর মাধ্যমে। তাতে কী লেখা ছিল? লেখা ছিল–

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط:
سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعوة الإسلام، أسلم
تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم اهل القبط.
﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

"পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে, আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে কিবতি-অধিপতি মুকাওকিসের নামে। শান্তি নামুক হেদায়াতের অনুসারীদের ওপর। অতঃপর আপনাকে আমি আহ্বান করছি ইসলামের দিকে। ইসলাম কবুল করুন, শান্তি লাভ করবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করবেন। আর যদি বিমুখ হন, তাহলে কিবতিদের পাপের ভাগী হবেন আপনি। "হে আহলে কিতাবীগণ! এসো এমন কথার দিকে, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমান। তা হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করবো না। আল্লাহকে বাদ দিয়ে কাউকে প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করবো না। আর যদি তোমরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলমান।"

চিঠি পেশ করার পূর্বে হাতেব ইবনে আবি বালতায়ার সাথে মুকাওকিসের একটি বিতর্ক হয়। মুকাওকিস বলেন, 'আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করতে পারবো না যতক্ষণ না এটা প্রমাণিত হবে যে আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা আমার ধর্মের থেকে শ্রেষ্ঠ।' মুকাওকিস খুবই যুক্তিসঙ্গত চ্যালেঞ্জ করলেন। তিনি ছিলেন খ্রিষ্টান। হাতেব ইবনে আবি বালতায়া রা. তখন এমন এক ভাষণ দিলেন, যারপর মুকাওকিস এটা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, হাতেব খ্রিষ্টধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পেরেছেন। মুকাওকিস আল্লাহর রাসুলের চিঠির উত্তর দিলেন। উত্তরে এটা স্বীকার

করলেন, আপনি যে নবুওতের দাবি করছেন তাতে আপনি সত্যবাদী। মুকাওকিস আল্লাহর নবীর জন্য কিছু হাদিয়া পাঠালেন। তার মধ্যে আল্লাহর রাসুলের সবচেয়ে প্রিয় ঘোড়া দুলদুল ছিল। একজন বাঁদি পাঠান, যাঁর নাম ছিল মারিয়া কিবতিয়া। তাঁর থেকে নবীজির একজন পুত্রসন্তান, ইবরাহিম জন্ম নেন।

নবীজি হিরাক্লিয়াস এবং মুকাওকিসের কাছে যে চিঠি লেখেছেন উভয়টিতে—

﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾

আহ্বানটি ছিল। কিন্তু পারস্যের সম্রাটের কাছে লেখা চিঠির ভঙ্গিমা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে

﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾

আহ্বানটি ছিল না। আবদুল্লাহ বিন হুযাইফা সাহমীর মাধ্যমে পাঠানো চিঠিটি ছিল ভিন্ন রকম। খ্রিষ্টান দুই রাজার অনুরূপ নয়। এটা মূলত জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতিকে বিবেচনায় রেখে দাওয়াতি প্রজ্ঞার এক অপরূপ নিদর্শন। চিঠির বক্তব্য ছিল এরূপ–

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس، سلام الله على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بداعية الله عز وجل، فإني أنا رسول الله الى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت، فإن إثم المجوس عليك.

"পরম করুণাময় অসীম দয়াবান আল্লাহর নামে। আল্লাহর নবী মুহাম্মদের পক্ষ হতে পারস্যের অধিপতি কিসরার প্রতি। যে ব্যক্তি সত্যপথের অনুসরণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাঁর প্রতি সালাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক-অদ্বিতীয় একক মহান সত্তা আল্লাহ, যাঁর কোনো শরীক নেই, তিনি ছাড়া অন্য কিছুই উপাসনার যোগ্য হতে পারে না। মুহাম্মদ সেই মহান সত্তার বান্দা ও রাসূল। রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ

আমাকে তাঁর রাসূল মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। যেন আমি ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি মানুষকে সেই পরাক্রান্ত সত্তার বিষয়ে অবহিত ও তাঁর অসন্তুষ্টি সম্বন্ধে সাবধান করি। ইসলাম কবুল করে নিরাপত্তা লাভ করুন। যদি অস্বীকৃত হন, তাহলে সকল অগ্নিউপাসক জনগোষ্ঠীর পুঞ্জীভূত পাপের বোঝা আপনাকেই বহন করতে হবে।"

খসরু পারভেজ একজন অগ্নিপূজক। সে মুসলিমদের সমান্তরাল কোনো বিশ্বাস লালন করে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমানদের ধর্মতাত্ত্বিক বাস্তবতার আলোকে তাদের দাওয়াত দিয়েছেন, আবার পারসিকদের ধর্মতাত্ত্বিক বাস্তবতার আলোকে তাদের দাওয়াত দিয়েছেন।

প্রশিক্ষিত দাঈদের কাফেলা

এগুলো ছাড়াও অনেক পত্র বিভিন্ন রাজা, আমির, গভর্নর প্রমুখের কাছে পাঠানো হয়েছে। আম্মানের দুই রাজা জায়ফার ইবনে জুলুন্দী আযদী ও উবাইদ ইবনে জুলুন্দী আযদীর কাছে পত্র পাঠান নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সেটা নিয়ে যান আমর ইবনে আস রা. ও আবু যায়েদ আনসারী রা.। ইয়ামামার দুই খ্রিষ্টান রাজা–সুমামা ইবনে উসাল হানাফী এবং হাওযাহ ইবনে আলী হানাফীর নিকটও পত্র পাঠান। সেটা নিয়ে যান হযরত সলীত ইবনে আমর রা.।

শাম সীমান্ত এলাকার রাজা হারিস ইবনে আবু শিমর গাসসানীর নিকট পত্র পাঠান। সেটা নিয়ে যান সুজা ইবনে ওহাব আসাদী রা.। ইয়ামানের রাজা হারিস ইবনে আবদে কুলাল হিমইয়ারীর নিকট পত্র পাঠানো হয়। সেটা নিয়ে যান মুহাজির ইবনে আবু উমাইয়া মাখযুমী রা.। বাহরাইনের প্রশাসক মানযার বিন সাওয়ার নামে প্রিয় নবী সা. পত্র পাঠান। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নেন। বাহরাইনের আবু কীস জনপদবাসীর নিকট মানকায বিন হাব্বান রা. এর মাধ্যমে প্রিয় নবী সা. পত্র পাঠান। মানকাযের রা. বুদ্ধিমত্তা ও হৃদয়গ্রাহী প্রভাবে গোটা এলাকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। পারস্যের অধিনস্ত হিজর রাজ্যের প্রশাসক সী বখতের নিকট নবীয়ে কারীম সা. পত্র পাঠান। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন।

পত্রগুলো খুবই কাজ করেছিল। ওমানের জায়ফার জুলুন্দী ও আবদ জুলুন্দী ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়াগুলোও সামনে এসে যাওয়া জরুরি ছিল। সেটাও হলো পত্রের মাধ্যমে অনেকটা। ইয়ামামার রাজা হাওয়াহ ইবনে আলী নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করে–যেন তাকে তিনি নিজের ক্ষমতার অংশীদার করে নেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

এইসব রাজা ও প্রধানদের কাছে প্রিয়নবীর প্রেরিত পত্রগুলো ছিল প্রবল আবেদনময়। যার যার আকিদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে দৃষ্টিতে রেখে লিখিত হয়েছে পত্রগুলো। এইসব পত্রের বাহক নির্বাচনেও ধর্মতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। প্রত্যেক সম্রাট ও প্রধানের জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন দূত নির্ধারণ করেন, যারা ঐ সম্রাটের সম্মান-মর্যাদা মোতাবিক কথা বলতে পারেন এবং সেখানকার ভাষা সম্পর্কে অবগত। সে দেশের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত।

ইবনে সাদ তাঁর তাবাকাতে এবং সুয়ুতী তাঁর খাসায়েসুল কুবরায় লেখেছেন, এইসব দাঈ যে দেশে গিয়েছেন, সে দেশের ভাষায় অবলীলায় কথা বলেছেন। একে তাঁরা প্রিয়নবীর মুজিযা বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদাভী রহ. এখানে নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রজ্ঞা-বিচক্ষণতা এবং সর্বোত্তম দাঈ মনোনয়নের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ও জনগোষ্ঠীসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত সাহাবাদের একটি জামাত তৈরি হয়ে যান। যাঁদের মধ্য থেকে সর্বোত্তমজনকে কোথাও প্রেরণের জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনোনীত করতে পারতেন।

এর সাথে যুক্ত করতে পারি তাঁদের ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কথা। খ্রিষ্টধর্ম ও পারসিক ধর্ম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের প্রধান একজন হিসেবে হযরত সালমান ফারসী রা.-কে যেমন দেখা যায় (তিনি এ বিষয়ে বরং তখনকার দুনিয়ার অন্যতম পণ্ডিত ছিলেন।), তেমনি ইহুদি ধর্ম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. শুধু আরব ইহুদিদের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, তা নয়, তিনি ছিলেন তখনকার দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ এক ইহুদিধর্ম-বিশেষজ্ঞ। কিন্তু এমন প্রধান সাহাবীদের কোথাও পাঠাতে হয়নি। কারণ আরও অনেকেই

ছিলেন, যাঁদের দ্বারা কাজ সম্পন্ন হবে। যেমন হযরত জাফর তৈয়ার রা.। নাজ্জাশীর দরবারে খ্রিষ্টতাত্ত্বিক পণ্ডিতকূল ও খ্রিষ্টান রাজার উপস্থিতিতে তিনি ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর উত্থাপিত অভিযোগের নিরসন করেন এবং ইসলামের এমন ব্যাখ্যা পেশ করেন, যার ওপর কারও আপত্তির সুযোগ ছিল না; বরং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকৃত হয়েছিল। এইসব সাহাবা ধর্মতাত্ত্বিক মুজাদালা (বিতর্ক) ও হিওয়ারে (সংলাপ) যেকোনো পরিস্থিতিতে জয় ছিনিয়ে আনতে ছিলেন পর্যাপ্ত যোগ্যতার অধিকারী।

খ্রিষ্টান রাজাদের কাছে দাওয়াতের কেন্দ্রীয় কথা ছিল—

﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾

কুরআন মাজীদের এই আহ্বান। মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে অমুসলিম কিংবা কিতাবে বিশ্বাসীদের সাথে ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক বা সংলাপে কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

আল-কুরআন ও ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

"এবং তাদের সাথে তর্ক করো উত্তমরূপে।"[৩]

বিতর্ক আসে বিরোধপূর্ণ বিষয়ে। যেখানে ইসলামের ছাড় দেওয়ার কিছু নেই, আবার ভিন্ন ধর্মের লোকেরাও ছাড় দেবে না, সেখানে বিতর্ক দানা বাঁধে। এ জায়গায় মানুষ সহজেই উত্তপ্ত ও অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। কিন্তু কুরআন মাজীদ জানাচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে উত্তমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। শুধু উত্তম বললে সবটুকু বলা হয় না। কুরআন মাজীদ বলছে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বনের জন্য। অবিশ্বাসীদের সাথে, ঈমানহীনদের সাথে, ধর্মহীনদের সাথে বিতর্ক করতে বলা হচ্ছে, কিন্তু বিতর্কটাকে হতে হবে সর্বোত্তম। কী মহীয়ান দিকনির্দেশনা! আরও অগ্রসর হয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে—

---

[৩] সূরা নাহ্‌ল : ১২৫

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...﴾

"তোমরা উত্তমপন্থা ছাড়া কিতাবধারীদের সাথে বিতর্ক করো না।"[৪]

এই যে মুজাদালাহ বা বিতর্ক, তার একটি ইতিবাচক ও আধুনিক পদ্ধতি হচ্ছে حوار বা সংলাপ। ধর্মে ধর্মে জ্ঞানভিত্তিক এই বিতর্ক, পর্যালোচনা বিশ্লেষণ ও সংলাপ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের মৌলিক প্রাণবস্তু।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু কুরআন মাজীদের জীবন্ত অবয়ব, তাই কুরআন মাজীদে বর্ণিত মুজাদালায়ে আহসানের শ্রেষ্ঠতম নমুনা তিনিই স্থাপন করবেন–এটাই স্বাভাবিক। হ্যাঁ, তিনি তাই ছিলেন এবং কুরআন মাজীদে ধর্মতাত্ত্বিক যে আলোচনা ও লক্ষ্য, তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। সকল ধর্মের মধ্য থেকে খোদাপ্রদত্ত সত্যধর্মকে যুক্তি, প্রমাণ ও আবেদনের যথার্থতা দ্বারা বিশ্বাসে ও বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে সত্য তিনি নিয়ে এসেছেন, তাকে জ্ঞানতাত্ত্বিক বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। অন্যসব মতাদর্শের ভ্রান্তি এবং বোধ-বিশ্বাস-কর্মের সঙ্গতিসমূহকে সুস্পষ্ট করেছেন, মানুষের সংশোধনের পথ দেখিয়েছেন।

কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে যাবতীয় মৌলিক মতাদর্শ প্রধানত সাতটি ধারায় বিভক্ত। এর মধ্যে এক আয়াতে একই সাথে ছয়টির উল্লেখ হয়েছে আল্লাহপাকের ইরশাদ–

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

"যারা ঈমান এনেছে আর যারা ইহুদি হয়েছে, যারা সাবেয়ি, খ্রিষ্টান ও আগুনপূজারী এবং যারা মুশরিক হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহপাক তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ সবকিছুর সম্যক প্রত্যক্ষকারী।"[৫]

সাত নম্বর ধারাটির আলোচনা পাই সুরা জাসিয়ার ২৪ নম্বর আয়াতে। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন–

---

[৪] সূরা আনকাবূত : ৪৬

[৫] সূরা হাজ্জ : ১৭

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾

"তারা বলে কেবল পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। আমরা মরি ও জন্ম নিই, আমাদের কেবল মহাকালই ধ্বংস করে। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা শুধু মনগড়া কথা বলে।"

সাত নম্বর এ ধারাটি ধর্মীয় বিশ্বাসের কোনো ধারা নয়। প্রকৃতপক্ষে অস্বীকৃতিবাদী ধারা। নাস্তিক্য ও অবিশ্বাসের সাথে এর সম্পর্ক। এটি ধর্মবিরোধী ভাবধারা। অতএব ধর্ম হিসেবে পাওয়া গেল ছয়টি ধারা।

১. ইসলাম,

২. ইহুদি,

৩. সাবেয়ি,

৪. খ্রিষ্টবাদ,

৫. মাজুসি বা অগ্নিপূজক,

৬. মুশরিক বা পৌত্তলিক।

কুরআন মাজীদ এসব ধর্মীয় ধারার বর্ণনাই শুধু প্রদান করেনি, এসবের প্রকৃতি, অনুসারীদের বিশ্বাস ও আচার-আচরণের বিবরণও দিয়েছে। তুলে ধরেছে এসবের ভ্রান্তি ও অসারতা। তাদের নানা দাবির খণ্ডন করেছে। কুরআন মাজীদের আলোচিত বিষয়গুলোর একটি হচ্ছে ইলমুল মুজাদালাহ বা মুখাসামাহ তথা দালিলিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক বিতর্ক।

মুজাদালাহ : একটি অনিবার্য বাস্তবতা

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বিতর্ককে মানব প্রকৃতির অংশ বলে জানিয়েছেন। কুরআন মাজীদের (সূরা কাহ্‌ফ: ৫৪) আয়াত হচ্ছে,

﴿كَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾

এই যে বিতর্কমুখী মানসিকতা, যা মানুষ মাত্রেই থাকে, এ বাস্তবতাকে ফিতরাতের ধর্ম হিসেবে ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। সৃজনশীল বিতর্ক ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সত্যকে চেনা, মিথ্যাকে জানা, ভুল ও শুদ্ধের পার্থক্য ধরার ক্ষমতাকে ইসলাম দুর্বল করতে চায়নি; বরং একে সবলতা দিয়েছে। ইসলাম তার প্রচারকের কাছে চায় উত্তম বিতর্ক, অনন্য পর্যালোচনা। ভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসীর সাথে, পণ্ডিতের সাথে কিংবা বিতার্কিকের সাথে ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কে ইসলামের প্রচারক হবেন শ্রেষ্ঠ, বিজয়ী, শক্তিমান, অপ্রতিরোধ্য কিন্তু মার্জিত, মহৎ, যুক্তিশীল।

মহানবী সা. কে আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের সঙ্গে সুন্দর পদ্ধতিতে বিতর্ক করার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তাদের অহংকার চূর্ণ হয়ে যায়। ইসলাম চায় এমন দাঈ, যিনি প্রজ্ঞার সাথে দ্বীনকে উপস্থাপন করবেন, মহোত্তম বক্তব্য থাকবে তার, মাওয়িযায়ে হাসানাহ থাকবে, মাওয়িযায়ে হাসানাহ কী? উত্তম উপদেশ, যা চিন্তার সংস্কার করবে, বোধ-বিশ্বাসের সংশোধনী আনবে, যেন ব্যক্তি হয় মুমীন, কর্মকে পরিশীলিত করবে, যাতে ব্যক্তি হয় সালেহ, সাদিক, আমীন তথা কল্যাণের প্রতিভূ। এ উপদেশ ব্যক্তির জন্য, সমাজের জন্য, জাতির জন্য, তাদের ইহকালের জন্য, পরকালের জন্য, জীবনের জন্য, জগতের জন্য। এর পরেই এসেছে বিতর্কের কথা। মুজাদালায়ে আহসানের কথা। সর্বোত্তম পদ্ধতি ছাড়া ইসলাম অন্য কিছুকেই অনুমোদন করে না। ভুল পদ্ধতি বা বাতিল প্রক্রিয়ার স্থান এখানে নেই। কারণ বাতিল পদ্ধতিতে যারা নফসের পূজারী, প্রবৃত্তির গোলাম। যারা ইসলামের প্রতিপক্ষ। বাতিল পদ্ধতি, অনুত্তম এবং অনুচিত প্রক্রিয়া সত্য থেকে মানুষকে দূরে সরায়, বিভ্রান্ত করে, সত্যে উপনীত হতে দেয় না। কুরআন (সূরা কাহ্‌ফ: ৫৬) জানাচ্ছে—

﴿لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ﴾

মুজাদালায় কুরআনী পদ্ধতি

কুরআন মাজীদে ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক রয়েছে। সেটা হয়েছে বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসের সাথে। ইহুদিদের সাথে, খ্রিষ্টানদের সাথে, মুশরিকদের সাথে, এমনকি মুসলিম নামধারী কপটদের সাথে- যারা হচ্ছে মুনাফিক। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহ. এ বিতর্কে দুটি প্রধান পদ্ধতি চিহ্নিত করেছেন।

প্রথম পদ্ধতি :

ইহুদি ধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম, অগ্নিপূজারী কিংবা যেকোনো রকমের মুশরিকদের ভুল ও বিভ্রান্তি সম্পর্কে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ভ্রান্ত বিশ্বাস, ভিত্তিহীন ধারণা, প্রথা ও কুসংস্কারসর্বস্ব ধর্মাচার ইত্যাদির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। দলিল-প্রমাণ পেশ করে তা খণ্ডনের দিকে যাওয়া হয়নি। তাদের সংস্কৃতির মধ্যে বিদ্যমান অমানবিকতা, তাদের আচার ও চর্চার মধ্যে বিদ্যমান ভ্রষ্টতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন: আরব মুশরিকদের আকীদা ছিল ফিরিশতারা আল্লাহর কন্যা। তারা অপছন্দ করতো কন্যা সন্তানকে। চাইতো না কন্যার জন্ম হোক। জন্ম হলেও প্রতিক্রিয়া হতো অমানবিক, নিষ্ঠুর। একটি বিষয় বিশ্বাসগত, আরেকটি বিশ্বাস ও কর্মগত। আল্লাহ তাআলা উভয়টির অযৌক্তিকতা, ভিত্তিহীনতা ও মন্দ দিক র্বণনা করে বলেন,

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ○ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ○ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ○﴾

"অর্থাৎ, মুশরিকরা কন্যাসন্তানকে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে। (অথচ) তিনি এসব থেকে অনেক পবিত্র। ওরা নিজেদের জন্য তাই কামনা করে, যা তারা পছন্দ করে। যখন এদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। যে বিষয়ে তাকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল, তার মনোকষ্টের কারণে সে (তার) জাতির লোকদের কাছ থেকে আত্মগোপন করে থাকতে চায়। (ভাবতে থাকে) সে কি একে

অপমানের সাথে রাখবে না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রেখো, ওরা যা সিদ্ধান্ত নেয়, তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট।" [সূরা নাহ্‌ল: ৫৭-৫৮-৫৯]

এভাবে আল্লাহ তাআলা ইহুদি, খ্রিষ্টানদের ভ্রান্ত আকীদার অযৌক্তিকতা ও ভিত্তিহীনতার উল্লেখ করেন। ইহুদিরা ওযাইর আ.কে আল্লাহর পুত্র দাবি করে, খ্রিষ্টানরা ঈসা মসীহকে আ. আল্লাহর পুত্র আখ্যায়িত করে। এটা তাদের মুখের কথামাত্র। প্রমাণহীন, ভিত্তিহীন। ভ্রান্তিপূর্ণ। কুরআন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে এমন দাবিকে। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾

"ইহুদিরা বলে উজায়র আল্লাহর পুত্র, খ্রিষ্টানরা বলে মাসিহ আল্লাহর পুত্র, (আসলে) এসবই হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এসব উক্তিতে এরা অনুসরণ করছে তাদেরই, যারা ইতিপূর্বে কুফরি করেছে। আল্লাহ পাক এদের বিনাশ করুন। কীভাবে এদেরকে ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে!!" [সূরা তাওবা: ৩০]

দ্বিতীয় পদ্ধতি:

খ্রিষ্টধর্ম, ইহুদি ধর্ম, মাজুসী ধর্ম, প্রতিমাপূজারীদের ধর্ম ইত্যাদির সাথে ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক করা হয়েছে। তাদের আকিদা-বিশ্বাস ও ধর্মাচারের উল্লেখ করে এর ভ্রান্তির সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। দালিলিকভাবে খণ্ডন করা হয়েছে তাদের দাবি ও ধারণা। যেমন, আল্লাহ তাআলা (সুরা আন্'আম:১০০) বলেন,

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ﴾

তারা আল্লাহর সাথে শরীক বানায় জিনদেরকে, অথচ তিনি জিনদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এ আয়াতে খণ্ডন করা হচ্ছে শিরককে। দলিল খুবই চমকপ্রদ। মানতিকের ভাষায় একে বলা হয় দলিলে খেতাবী।

আয়াতে সংক্ষেপে বলা হলো সেই ধর্মাবলম্বীদের কথা, যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে অশরীরীদের, দেও-দানব, জিনদের। কিন্তু এই অংশ

বানানো যে একেবারেই অবাস্তব, অগ্রহণযোগ্য, সেটা এক শব্দেই বলে দেওয়া হলো। তারা এদেরকে আল্লাহর শরীক বানায় অথচ ﴿وَخَلَقَهُمْ﴾ তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সকলেই জানে এবং মানে যে, শরীক এবং সমকক্ষ সর্বদা সেই হয়ে থাকে যে সমতুল্য এবং সমমর্যাদা সম্পন্ন হয়। অতএব দেও-দানব, জিনরা আল্লাহর সমতুল্য বা সমমর্যাদা সম্পন্ন নয়। কারণ আল্লাহ হচ্ছেন স্রষ্টা আর তারা হচ্ছে সৃষ্টি সুতরাং স্রষ্টা আর সৃষ্টি এক হতে পারে না। বিধায় জিনদেরকে আল্লাহর শরীক এবং সমকক্ষ সাব্যস্ত করাও বাতিল। দলিল প্রদানে কুরআন মাজিদ বোধগম্য, সরল, সহজাত প্রক্রিয়াই অবলম্বন করে। মানুষ সাধারণত জ্ঞান ও বুদ্ধিগত যেসব প্রক্রিয়ায় কোনো কিছুকে প্রমাণ করে বা খণ্ডন করে, কুরআন মাজিদ এর বাইরে কোনো পথ অবলম্বন করেনি। কোনো বিষয়কে প্রমাণে عقلي বা বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল সাধারণত চারভাবে উপস্থাপন করা হয়। যেমন :

১. نقلي বা ঐতিহাসিক দলিল।

২. منطقي বা তার্কিক দলিল।

৩. مشاهدائي বা চাক্ষুষ ও পর্যবেক্ষণমূলক দলিল।

৪. تجرباتي তথা পরীক্ষিত দলিল।

কুরআন মাজিদে ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনায় চার ধরনের দলিলের কোনো ধরনের অনুপস্থিতি চোখে পড়ে না। সবগুলো ধরনই বিদ্যমান।

নকলী বা ঐতিহাসিক দলিল এমন এক শক্তিশালী মাধ্যম, যাকে প্রতিপক্ষও গ্রহণ করে নেয়। প্রামাণ্য ইতিহাসকে واجب التسليم বা অপরিহার্য হিসেবেই মেনে নেওয়া হয়। মানতিকী বা তার্কিক দলিল প্রতিপক্ষকে এমন সূত্র ও বিষয় দেখায়, যা তাকে এমন এক ফলাফলে বা সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়, যেখানে সত্য আছে। কিংবা যেখানে مدعي বা বাদী উপনীত হয়েছে।

মুশাহিদাতী দলিল বৈজ্ঞানিক ধারার। কোনো বিষয় বা বস্তুর বাস্তবতা পরীক্ষা, যাচাই-বাছাই, পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও উদ্‌ঘাটন এগুলো বিজ্ঞান ও

গবেষণার কাজ। অনুসন্ধান, নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফসল হিসেবে চাক্ষুষ যে ফলাফল অর্জিত হয়, বিজ্ঞানে তার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এটা আজকের দুনিয়ায় খুবই গুরুত্বের দাবি রাখে।

তাজরিবাতী বা পরীক্ষিত দলিল এর কাছাকাছি অনেকটা। সেটা হচ্ছে মানব জাতির অতীত অভিজ্ঞতা থেকে, অতীতের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আচরণের ফলাফল থেকে, কোনো চিন্তা ও আচরণ কোন কোন ফলাফল নিয়ে এসেছিল, কীসে কল্যাণ এসেছিল, কীসে বিপর্যয়—ইত্যাদির প্রামাণ্য উপস্থাপনা। কুরআন মাজিদ সবগুলো প্রক্রিয়ায় ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা ও বিতর্ক করেছে।

دليل نقلي

বা ঐতিহাসিক দলীল

আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীব মুহাম্মদ সা. এর নবুওয়াত ও রিসালত প্রমাণ করার জন্য পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি যে নবী, শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী তার প্রমাণ, তার আলামত পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান আছে। এটা একটা অকাট্য প্রমাণ তাদের জন্য, যারা সেসব গ্রন্থকে মানেন। তাওরাতে এমনটি আছে, ইঞ্জিলে এমনটি আছে, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে আছে। অতএব একজন ইহুদি, একজন খ্রিষ্টান কেন ও কীভাবে অস্বীকার করবে তাঁর রেসালাতের প্রামাণ্যতা? কুরআনে (সূরা শু'আরা: ১৯৬) আছে,

﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾

মুসলিমরা বিশ্বাস করেন, তাওরাত-ইঞ্জিল ইত্যাদি বিকৃত। এটা শুধু মুসলিমদের বিশ্বাস নয়, দায়িত্বশীল খ্রিষ্টানদের বক্তব্যও অনুরূপ। এটা প্রমাণিত ও ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু তারপরেও একে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মানেন এমন মানুষের সংখ্যা অগণিত। তাঁদের কাছে যার যার গ্রন্থ সর্বোচ্চ প্রমাণ। অতএব কুরআন মাজীদ মহানবীর সা. সম্পর্কে সেই সব গ্রন্থে বিদ্যমান থাকা ভবিষ্যদ্বাণী ও আলামতসমূহকে প্রমাণ হিসেবে তাঁদের সামনে উপস্থাপন করলো।

ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾

"স্মরণ করো, যখন মরিয়মতনয় ঈসা বললো, হে ইসরাইল সন্তানরা, আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল। তাওরাতে যা আছে, তার সত্যায়নকারী। আর এক রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আসবেন আমার পরে, তার নাম হবে আহমাদ। অতঃপর যখন তিনি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এলেন, তারা বললো, এ তো প্রকাশ্য জাদু।"(সূরা সাফ্ফ: ৬)

منطقي دليل

বা যুক্তিভিত্তিক ও দার্শনিক দলীল

মানতিকী বা যুক্তিবাদী ও দার্শনিক দলিল নানা প্রক্রিয়ায় এসেছে। এর মধ্য থেকে নমুনা হিসেবে প্রধান কয়েকটি প্রক্রিয়া নিয়ে আমরা কথা বলবো।

القياس الإقتراني

মানতিকী দলীলের সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রকারটিকে কিয়াসে ইকতেরানী বলা হয়। এ কিয়াসে সাধারণত ব্যাপক নীতি বর্ণনা করা হয় এবং নিজ দাবিকে সে নীতে অনুযায়ী মিলানো হয়। এর প্রথম অংশকে বলা হয় সুগরা, দ্বিতীয় অংশকে কুবরা। কুরআনে কারীমে এর অনেক উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, পরকালে অবিশ্বাসীরা বলে, মানুষের অস্থিমজ্জা যখন মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবে, তখন তাকে আবার নতুন করে জীবিত করা কীভাবে সম্ভব? আল্লাহ তাআলা বলেন, অবশ্যই এটা সম্ভব। কেননা,

﴿بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾

"পরন্তু আমি তার অঙ্গুলিগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম।" (সুরা কিয়ামাহ: ৪)

যে সত্তা অঙ্গুলির গোশতের টুকরায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করতে সক্ষম, এক অঙ্গুলির ছাপের সাথে অপর অঙ্গুলির মিল যেখানে মোটেও থাকে না, সেই ছাপ, রেখা, ইত্যাদিকেও যিনি বিন্যস্ত করতে সক্ষম, তার পক্ষে মানবদেহকে পুনর্গঠন করা সম্ভব। তিনি অবশ্যই অস্থিমজ্জাকে জীবিত করতেও সক্ষম। সুতরাং পরকালের দিবসকে প্রতিপন্ন করা ভিত্তিহীন কথা।

القياس الاستسنائي

এ দলীলটি সাধারণত কোন বিষয়কে নেতিবাদী অবস্থান থেকে যাচাই করার জন্য প্রয়োগ হয়। এর দুটি অংশ থাকে। যেমন, আপনি প্রমাণ করতে চান এখন বর্ষা ঋতু নয়। আপনি প্রমাণ করবেন এভাবে, যদি এখন বর্ষা ঋতু হতো, এর আগে অতিক্রান্ত হতো গ্রীষ্ম ঋতু, আকাশে থাকতো ঘনমেঘ, বারবার হতো বৃষ্টি, নদীতে থাকতো জলের যৌবন, জোয়ার, বনে-বাদাড়ে শোনা যেত ব্যাঙের ডাক, খাল বিল থইথই করতো পানিতে, যেহেতু এর কোনোটাই এখন নেই, অতএব এখনকার ঋতু বর্ষা নয়। এ জাতীয় অনেক দলীল রয়েছে কুরআন মাজিদে। একটি উদাহরণ লক্ষ করুন। তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদকে প্রমাণ করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا﴾

"যদি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবুদ থাকতো, তবে আসমান-জমীন ধ্বংস হয়ে যেত।" (সূরা আম্বিয়াঃ ২২)

যেহেতু আকাশ বিদ্যমান আছে, পৃথিবী বিদ্যমান আছে, দুই বা ততোধিক শক্তিসম্পন্ন খোদা থাকলে তাদের সংঘাতে জগৎব্যবস্থাপনা লণ্ডভণ্ড হয়ে যেত, আকাশ ভেঙে যেত, পৃথিবী ধ্বংস হতো, অতএব খোদা একজনই। পৃথিবীর বিদ্যমান থাকাটাই প্রমাণ করছে খোদার একত্ব।

السبر والتقسيم

বা বিভাজন রীতি

মানতিকী প্রমাণ পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ এক ধরন হচ্ছে 'সাবর ও তাকসীম' বা 'বিভাজন রীতি'। এর দ্বারা প্রতিপক্ষের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এটা এভাবে যে, দাবিকারীকে বলা হবে, তোমার দাবি প্রমাণের সম্ভাব্য যেসব

উপাদান আছে, এর কোনো একটি বিষয়কে প্রমাণিত হতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে। যদি তা না হয়, তাহলে দাবিটাই ভ্রান্ত।

কাফির সম্প্রদায় কখনো কখনো হালাল জানোয়ারের নরগুলোকে নিজেদের উপর হারাম করে নিত, আবার কখনো মাদীগুলোকে। আল্লাহ তাআলা তাদের এ কার্যকলাপ প্রত্যাখ্যান করে বলেন,

﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهَذَا﴾

"তিনি সৃষ্টি করেছেন উটের মধ্যে দুই প্রকার এবং গরুর মধ্যে দুই প্রকার। আপনি জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে, না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন আল্লাহ এ নির্দেশ দিয়েছিলেন?"

(সূরা আন'আম: ১৪৪)

التسليم

মানতেকী প্রমাণপদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ একটি ধরন হচ্ছে তাসলীম বা মেনে নেয়া। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের কোনো কথা অথবা দাবিকে মেনে নিয়ে এ কথা বলা যে, এটা মেনে নেওয়ার পরও উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। কাফিররা বলে বেড়াত যে, আমাদের নিকট জনৈক মানুষকে নবী না বানিয়ে কোন ফেরেশতাকে কেন প্রেরণ করলেন না? একাধিকভাবে আল্লাহ তাআলা তাদের এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। একটি জবাব লক্ষ করুন—

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾

"যদি আমি তাকে ফেরেশতা করতাম, তবে অবশ্যই মানবাকৃতিতে প্রেরণ করতাম।" (সূরা আন'আম: ৯)

মর্ম পরিষ্কার। ফেরেস্তাকে নবী বানালে ফেরেশতার আকৃতি, স্বভাব, চরিত্র ও প্রবণতা নিয়ে তিনি পৃথিবীতে এসে মানবজাতিকে সামগ্রিক জীবনের পথপ্রদর্শন করতে পারতেন না। তাকে তখন মানুষ আকারে, মানুষের নিয়মে, মানুষের জীবনই যাপন করতে হতো। অতএব ফেরেশতাকে নবী বানানোর দাবি মেনে নিলেও প্রয়োজন পুরো হচ্ছে না।

الانتقال

মানতিকী পদ্ধতিতে বিতর্কে কখনো দলীলকে প্রতিপক্ষ বুঝতে পারে না অথবা ভুল বুঝে এবং আরেকটি ভুল প্রসঙ্গ সামনে আনে। মূল বিষয়ে প্রদত্ত দলিলের জবাব এড়িয়ে প্রতিপক্ষ অন্য দিকে চলে যায়। এ প্রেক্ষাপটে প্রতিপক্ষের নির্বুদ্ধিতা বা চালাকিকে নস্যাৎ করার জন্য ভিন্নধারার দলিল পেশ করার নাম ইনতেকাল বা স্থানান্তর।

হযরত ইবরাহীম আ. এর একটি ঘটনার মাঝে তার উজ্জ্বল একটি উদাহরণ আছে। নমরূদের সাথে তাঁর বিতর্ক হয়েছিল। আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহীদের উপর ইবরাহীম আ. এ দলীল পেশ করলেন, (২.৫৮)

﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾

"আমার প্রভু তো তিনি, যিনি জীবন দান এবং মৃত্যু দান করেন।"

তখন নমরূদ নিষ্পাপ একটি শিশুকে হত্যা করে এবং এক ব্যক্তিকে মুক্তিদান প্রদান করেন, যার উপর ফাঁসির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর সে বললো, ﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ আমি মারতে পারি, জীবন দিতে পারি। হযরত ইবরাহীম আ. বুঝলেন যে, এ আহম্মক নির্বোধ জীবিত করা ও মৃত্যু দান করার অর্থ বুঝতে পারেনি। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে নির্বাক করার জন্য আর একটি দলীল পেশ করলেন যে,

﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾

"আল্লাহ তাআলা তো সূর্যকে উদিত করেন পূর্বদিক থেকে, তুমি সেটাকে উদিত করো পশ্চিম দিক থেকে।"

এটা ছিলো 'ইনতেকাল'। এর দ্বারা নমরূদের বাকপটুতা নিমিষেই খতম হয়ে গেল।

﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾

"তখন ওই কাফির হতবুদ্ধি হয়ে গেল।"

مشاهدائي دليل

বা দৃশ্যমান দলীল

পবিত্র কুরআনে এ জাতীয় দলীল ব্যাপকহারে বর্ণিত হয়েছে। কারণ তার্কিক ও দার্শনিক দলীলের মাধ্যমে মানুষ নিরুত্তর ও নিশ্চুপ হয়ে গেলেও মানসিক স্বস্তি ও প্রশান্তি বোধ করে না; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষয়টি মনঃপূত হয় না কুরআনে কারীমের উদ্দশ্যে কাউকে নিশ্চুপ কিংবা নিরুত্তর করা নয়; বরং সত্য কথাটি শ্রোতার অন্তরে ঢেলে দেওয়াই উদ্দেশ্য। তা ছাড়া তার্কিক ও দার্শনিক দলীল বিশেষ শ্রেণির জন্য কল্যাণকর হলেও সাধারণ মুখ ও অশিক্ষিতদের জন্য ফলপ্রসূ হতে পারে না। তাদের জন্য চাক্ষুস দলীলই অধিক কার্যকর হয়ে থাকে। যার দরুণ একজন গ্রাম্য ব্যক্তির মনের অগোচরে বলে উঠে—

«البعرة تدل على البعير والأثر على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج كيف تدل على اللطيف الخبير»

"রাস্তায় পতিত উটের মল যদি উটের সন্ধান দেয় এবং পদচিহ্ন যদি আগন্তুকের সন্ধান দেয়। তাহলে কক্ষপথবিশিষ্ট আকাশ এবং র্গত ও খাদবিশিষ্ট ভূতল সূক্ষ্মজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞাত স্রষ্টার সন্ধান দেবে না কেন?"

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ প্রমাণ করতে গিয়ে চাক্ষুস দলীল পেশ করেছেন। যেমন,

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾

"নিশ্চয় আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন-রাতের বিবর্তনে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য।"

(সূরা আলে ইমরান: ১৯০)

تجرباتي دليل

পরিক্ষীত দলীল

পবিত্র কুরআনে অতীত জাতিগোষ্ঠীর تجربات তথা অভিজ্ঞতার দিকেও দৃষ্টিপাত করেছে। যেমন: বারবার ঘোষণা করেছে, তোমরা দুনিয়া ঘুরে দেখো, দেখো, কী পরিণতি হয়েছে পাপী সম্প্রদায় সমূহের? দেখো কী কর্মফল লাভ করেছে বিভিন্ন জাতি? মিথ্যারোপকারীদের পরিণতি কেমন হয়েছে? সত্যের অনুগামীদের সুফল কেমন হয়েছে? এমন আহ্বান নানাভাবে এসেছে, (সূরা আন'আম: ১১)

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

কুরআন মজিদে অপরাপর জাতি, সভ্যতা ও ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভ্রান্তি তুলে ধরা হয়েছে। সত্য পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ অনেক দীর্ঘ হতে বাধ্য। আমরা এ বিষয়ে একদিন স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ। কুরআন মাজীদের ধারায় সীরাতে ও আহাদীসে রাসুলে মুজাদালার নমুনা রয়েছে বিস্তর। ইহুদিদের সাথে, খ্রিষ্টানদের সাথে, মুশরিকদের সাথে নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে বহুবার।

প্রজ্ঞাবান শ্রেণির খোরাক আলাদা

আনাস রা. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. শুনলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমন করেছেন। তিনি তাঁর কাছে এসে বললেন,

«إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي»

"আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করবো, নবী ব্যতীত কেউ যার উত্তর দিতে পারে না।"

বিষয় তিনটি হলো–

«ما أول أشراط الساعة»

"কিয়ামতের প্রথম আলামত কী?"

«وما أول طعام يأكله أهل الجنة»

"জান্নাতীরা প্রথম কোন খাবার খাবে।"

«ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله»

"সন্তান কীভাবে পিতার মতো এবং কীভাবে তার মাতুলদের মতো হয়?"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل»

"আমাকে এইমাত্র জিবরাঈল আ. এ-ব্যাপারে জবাব জানালেন।"

তখন আবদুল্লাহ বললেন,

«ذاك عدو اليهود»

"তিনি তো ইহুদিদের দুশমন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له إن سبق ماؤها كان الشبه لها»

"কিয়ামতের প্রথম আলামত হচ্ছে, একটি আগুন। যা বের হয়ে মানুষকে পূর্ব দিক হতে পশ্চিম দিকে নিয়ে যাবে। আর জান্নাতীদের প্রথম খাবার হবে মাছের কলিজা। সন্তান কারও সাদৃশ্য পাওয়ার কারণ হলো, স্ত্রীর সাথে সহবাসে যদি পুরুষের বীর্য অগ্রণী হয় সন্তান পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। আর যদি স্ত্রীর বীর্য অগ্রণী হয়, সন্তান তখন স্ত্রীর সাদৃশ্য পায়।"

জবাব শুনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহুদিরা মিথ্যুক জাতি, যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার আগে আমার ইসলামের কথা তারা জেনে যায়, তবে আমাকে মিথ্যুক বানিয়ে ছাড়বে। তারপর আবদুল্লাহ ইহুদিদের কাছে আসলেন এবং তাদের ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম কেমন লোক?

তারা বললো, আমাদের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি এবং জ্ঞানী ব্যক্তির সন্তান। আমাদের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি এবং উত্তম ব্যক্তির সন্তান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে? তারা বলল, আল্লাহ তাকে এ ধরনের কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বের হয়ে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত হক কোনো মাবুদ নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তখন তারা বলল, সে আমাদের সবচেয়ে খারাপ লোক এবং খারাপ লোকের সন্তান। এভাবে তারা তাঁর ওপর আক্রমণাত্মক কথা বলতে লাগলো। এই যে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. এর ইসলাম গ্রহণ, সেটা হয়েছে জ্ঞানতাত্ত্বিক সংলাপের ফসল হিসেবে।

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থে বিদ্যমান যে জ্ঞান ইবনে সালামের অর্জিত ছিল, তা দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন প্রিয়নবীর সা. নবুওতের সত্যতা যাচাই করবেন। এমন সব প্রশ্ন নির্বাচন করেছিলেন, নবী ছাড়া কারও পক্ষে যার সঠিক জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না। ইবনে সালাম রা. জানতেন, প্রিয়নবী সা. যেহেতু উম্মী, তাই তাওরাত থেকে সূক্ষ্ম ও রহস্যপূর্ণ জ্ঞান তিনি অর্জন করবেন, তা অসম্ভব। আরবের কেউ তাঁকে শেখাবে, সেটাও অসম্ভব। অতএব তিনি সত্য-সঠিক জ্ঞান জানাতে সক্ষম হবেন কেবল তখন, যখন তিনি ওহীর মাধ্যমে নিশ্চিত সত্য অবগত হবেন। নতুবা নিজের পক্ষ থেকে জবাব দিতে গেলে আরবের তখনকার ধারণানির্ভর জবাব দেবেন। যা মোটেও যথার্থ নয়। প্রিয়নবী সা. যথার্থ জবাব পেশ করলেন। ইবনে সালাম রা.-এর ধর্মতাত্ত্বিক মানস এতে প্রশান্ত হলো।

পরধর্মগ্রন্থ ও সত্যগোপন : প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ

ইহুদিরা নানাভাবে চেষ্টা করেছে, ধর্মীয় জ্ঞানের জায়গা থেকে, তাদের ধর্মগ্রন্থের প্রাসঙ্গিক নানা বিষয় থেকে প্রিয়নবী সা. ও মুসলিমদের বিব্রত করতে। তারা তাদের ধর্মীয় বিষয়ে সত্যগোপন করতো। যা তাদের স্বভাবের অংশ ছিল। কিন্তু গোপন করার পরে এ বিষয়ে প্রিয়নবীর সায় লাভের অপেক্ষা করতো। যদি নবীয়ে কারীম সা. সায় দেন, তাহলে তারা প্রশ্ন তোলবে, একজন নবী হয়ে তিনি কীভাবে ভুলকে সমর্থন করলেন? কীভাবে মিথ্যার সাথে একমত হলেন? তাদের এমন অপকৌশলের একটি রূপ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এসে বলল, তাদের একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ব্যভিচার করেছে। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন,

«مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ»

"প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা সম্পর্কে তাওরাতে কি বিধান রয়েছে?"

তারা বললো,

«نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ»

"আমরা এদেরকে লাঞ্ছিত করবো এবং বেত্রাঘাত করবো।"

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বললেন,

«كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ»

"তোমরা মিথ্যা বলছো। তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার বিধান রয়েছে।"

তারা তাওরাত নিয়ে এসে বের করল এবং প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা সংক্রান্ত আয়াতের উপর হাত রেখে তার পূর্বের ও পরের আয়াতগুলো পাঠ করল। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বললেন,

«ارْفَعْ يَدَكَ»

তোমার হাত সরাও। সে হাত সরাল। তখন দেখা গেল সেখানে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার বিধান রয়েছে। তখন ইহুদিরা বলল,

«صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ»

"হে মুহাম্মদ! তিনি (আবদুল্লাহ ইবনু সালাম) সত্যই বলেছেন। তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার বিধান রয়েছে।"

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রস্তর নিক্ষেপে দুজনকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমি (প্রস্তর নিক্ষেপকালে) ওই পুরুষটিকে মেয়েটির দিকে ঝুঁকে পড়তে দেখেছি। সে মেয়েটিকে প্রস্তরের আঘাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করছিল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভিন্নধর্মীদের ধর্মতাত্ত্বিক অপকৌশলকে ব্যর্থ করে দেওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন লোক নবীজীর সা. জামাতে ছিলেন। এটা থাকতে হয়, সর্বকালেই এর প্রয়োজন পড়ে, পড়বে। বিভিন্নভাবে, বিবিধ আঙ্গিকে। প্রিয় নবী সা. ইহুদিদের ধর্মীয় শিক্ষাগারে, ধর্মীয় পুরোহিত ও পণ্ডিতদেরও আহ্বান করেন, যেন তারা তাওরাতের জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারে, প্রিয়নবী সা. সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনিই সত্য নবী।

'তাহলে তাওরাত নিয়ে আসো, তাওরাত ফয়সালা করবে'

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের একটি «بَيْتَ الْمِدْرَاسِ» বা শিক্ষায়তনে প্রবেশ করলেন। যেখানে একদল ইহুদি অবস্থান করছিল। তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করলেন। তখন নুমান ইবনে আমর এবং হারেস ইবনে যায়েদ বললো,

«عَلَى أَيِّ دِيْنٍ أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ؟»

"হে মুহাম্মাদ! তোমার দ্বীন কোনটি?"

জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَ دِيْنِهِ»

আমি ইবরাহীমের দ্বীনের ওপর। তারা উভয়ে বললো,

«فَإِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ يَهُوْدِيًا»

"ইবরাহীম তো ইহুদি ছিলেন। নিশ্চিতই ইহুদি ছিলেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«فَهلَمَّ إِلَى التَّوْرَاةِ، فَهِيَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ»

"তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো। আমাদের ও তোমাদের মাঝে সেটাকে ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করো।"

কিন্তু তারা উভয়ে তা করতে অস্বীকার করলো। তখন আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ﴾

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যাদেরকে কিতাবের অংশ প্রদান করা হয়েছিল, যাতে ওটা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়; তারপর তাদের একদল ফিরে দাঁড়াল, আর তারাই পরাঙ্মুখ।" (সূরা আলে ইমরান: ২৩)

নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদল

৭৩টি জনপদ নিয়ে নাজরান নগরী ছিল সেকালে খুবই সমৃদ্ধ একটি নগররাষ্ট্র। একটি দ্রুতগতির ঘোড়া সারাদিনেও এই নগর প্রদক্ষিণ করে শেষ করতে পারতো না। শহরটিতে ছিল এক লক্ষ দক্ষ যোদ্ধা। মক্কা থেকে ইয়ামানের দিকে সাত মঞ্জিল দূরের এই শহর ছিল সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।

বায়হাকী দালায়েল-এর বর্ণনা মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরানবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র লেখেন,

«مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلَى أَسْقُف نَجْرَان: إِنْ أَسْلَمْتُمْ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمْ إِلَهَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ مِنْ

عِبَادَةِ الْعِبَادِ، وَأَدْعُوكُمْ إِلَى وِلَايَةِ اللهِ مِنْ وِلَايَةِ الْعِبَادِ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَالْجِزْيَةُ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ آذَنْتُكُمْ بِحَرْبٍ وَالسَّلَامُ»

"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হতে নাজরানের বিশপ-এর প্রতি। যদি তোমরা ইসলাম কবুল করো, তাহলে আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করব, যিনি ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব-এর উপাস্য। অতঃপর আমি তোমাদেরকে মানুষের দাসত্ব হতে আল্লাহর দাসত্বের প্রতি এবং মানুষের বন্ধুত্ব হতে আল্লাহর বন্ধুত্বের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। যদি তোমরা অস্বীকার করো, তাহলে জিযিয়া দেবে। যদি সেটাও অস্বীকার করো, তাহলে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি। ওয়াসসালাম।"

এরপর নাজরান থেকে খ্রিষ্টধর্মের বিশেষজ্ঞ পুরোহিতরা মদীনায় আসে প্রতিনিধি হিসেবে। দু-বার এই প্রতিনিধিদলের আগমন ঘটেছিল। প্রথমবার তিনজন এবং পরের বার ৬০ জন। দুটি দলই সম্ভবত অল্পদিনের ব্যবধানে নবম হিজরীতে মদীনায় এসেছিল এবং ইসলাম কবুল করা ছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল।

জ্ঞানভিত্তিক ও বাস্তবমুখী সংলাপ

নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদের সাথে প্রিয়নবীর একটি সংলাপের বিবরণ এসেছে সীরাতে ইবনে হিশামে। যার বিষয়বস্তু হলো–খ্রিষ্টানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি করলো। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঈসা আ.-এর পিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলো এবং আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার অপবাদ ও মিথ্যা বলে বেড়াতে লাগলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা জানো যে সন্তানরা তাদের পিতারই সদৃশ হয়।'

তারা বললো, 'অবশ্যই।'

তিনি বললেন, 'তোমরা কি জানো না যে, আমাদের প্রভু চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই, অথচ ঈসার অস্তিত্ব বিলীন হবে?'

তারা বলল, 'অবশ্যই।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমাদের রব সবকিছুর ধারক-বাহক, তিনি সবকিছুর সংরক্ষণ করেন ও রিযিক দিয়ে থাকেন?'

তারা বলল, 'নিশ্চয়ই।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তাহলে ঈসা ইবনে মারইয়াম কি এগুলোর কোনো কিছু করতে সক্ষম?'

তারা বলল, 'না।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা কি জানো না যে, আসমান ও যমীনের কোনো সৃষ্টিই তাঁর কাছে গোপন নেই?'

তারা বলল, 'নিশ্চয়ই।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমার প্রভু ঈসাকে যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে মাতৃ-উদরে আকৃতি দান করেছেন। আর আমার প্রতিপালক খানা-পিনা করেন না এবং কোনো অপবিত্র কাজও ঘটান না।'

তারা বলল, 'নিশ্চয়ই।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা কি জানো না যে, অন্যান্য মহিলাদের মতো ঈসাও মায়ের গর্ভে লালিত-পালিত হয়েছেন? তারপর অন্যান্য মহিলারা যেভাবে বাচ্চা প্রসব করে তাঁর মাও তাঁকে সেভাবে প্রসব করেছেন এবং অন্যান্য বাচ্চাদের মতো তাঁকেও খাওয়ানো হয়েছে। তারপর তিনি খাবারও খেয়েছেন, পানও করেছেন এবং অপবিত্রও হয়েছেন?'

তারা বলল, 'অবশ্যই।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তাহলে তোমরা যা ধারণা করছ তা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? এরপর তাদের সবাই চুপ হয়ে গেল। এ পরিপ্রেক্ষিতে সুরা আলে ইমরানের প্রথম থেকে আশিরও অধিক আয়াত নাযিল হয়।'

আয়াতগুলো প্রতিনিধিদলকে শুনিয়ে দেওয়া হলো। প্রিয়নবী সা. মুবাহালার আয়াত তেলাওয়াত করলেন। যেখানে বলা হয়েছে, হে নবী, তাদেরকে আপনি বলে দিন, যদি তোমরা কোনোভাবেই সত্যকে গ্রহণ করতে না পারো এবং সত্যকে স্বীকার না করো, তাহলে সিদ্ধান্ত শেষ অবধি এটাই হবে যে, আমরা আমাদের সন্তানদের নিয়ে আসি, তোমরা নিয়ে এসো তোমাদের সন্তানদের। আমরা আমাদের নারীদের নিয়ে আসি, তোমরা নিয়ে এসো তোমাদের নারীদের। আমরা আমাদের জীবনকে পেশ করছি, তোমরা পেশ করো তোমাদের জীবনকে। এরপর সবিনয়ে এসো আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, হে প্রভু! আমাদের মধ্যে যারা আকিদায় ভ্রান্ত, সত্যকে যারা গ্রহণ করতে চায় না, আপনি তাদের প্রতি লানত বর্ষণ করেন। এ ছিল কঠিনতম চ্যালেঞ্জ। আল্লাহর নির্দেশে এ চ্যালেঞ্জ নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদের সামনে পেশ করলেন প্রিয়নবী সা.। তারা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সাহসী হয়নি। বরং পরস্পরে এটাই বলছিল যে, মুবাহালা করো না। যদি তা করি আর তিনি নবী হন, তাহলে আমাদের বংশধরদের কোনো রক্ষা নেই। কিন্তু নবীয়ে কারিম সা. তাদেরকে ঘোষণা শুনিয়ে হাসান-হুসাইন রা. এবং ফাতেমা রা.কে নিয়ে ময়দানে বেরিয়ে পড়লেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে আলী রা.ও সাথে ছিলেন।

নবীয়ে কারীম সা. এর এই দৃঢ়তা দেখে, সত্যের প্রতি অবিচল আস্থা দেখে, সত্যপ্রমাণের নির্ভীকতা দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল ভীষণ। তাদের দুই সরদার আবদুল মসিহ আকিব ও আবহাম নবীজীর দরবারে এসে বিনয়ের সাথে মিনতি করে, যেন মুবাহালা থেকে তারা মুক্ত হন। তারা জিযিয়া কর দিতে সম্মত হন এবং শান্তি চুক্তির আবদার জানান। নবীয়ে কারীম সা. আবদার গ্রহণ করেন। চুক্তি সম্পন্ন হয়। চুক্তিপত্রটি লেখেন হযরত মুগিরা বিন শু'বা রা.। এতে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন আবু সুফিয়ান ইবনে হারব রা. গায়লান বিন আমর রা. মালিক বিন আওফ রা. এবং আকরা বিন হাবিস রা.।

সত্যের জন্য ক্ষুধার্ত মানুষ ও তাদের প্রতিক্রিয়া

অতঃপর প্রতিনিধি দলটি নিজ গোত্রে ফিরে আসে। তাদেরকে অভ্যর্থনার জন্য বিশপের নেতৃত্বে একটি দল আগেই নগরীর বাইরে এসে গিয়েছিল। চুক্তিনামাটি বিশপের হাতে দেওয়া হলো। তার চাচাতো ভাই আবু আলক্বামা বিশর বিন মুআবিয়া তার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। ফলে তিনি উটের পিঠ থেকে নিচে পড়ে গেলেন এবং রাসূল সা. সম্পর্কে বলেন, 'ওই ব্যক্তির মন্দ হোক, যিনি আমাকে এই কষ্ট দিলেন'। বিশপ তাকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, তুমি কি বলছ, মুখ সামলে বলো।

«وَاللهِ إِنَّهُ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ»

"আল্লাহর কসম! ইনি আল্লাহর প্রেরিত নবী"।

«واللهِ إِنَّهُ لَلنَّبِيُّ الذى كُنَّا نَنْتَظِر»

"আল্লাহর কসম! ইনি অবশ্যই সেই নবী, আমরা যার অপেক্ষা করে আসছি।"

কথাটি শুনলেন আবু আলক্বামা। শুনেই তার উটের মুখ মদীনার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং ওই অবস্থাতেই রওনা করলেন। বিশপ তাকে বারবার অনুরোধ করেও ফেরাতে ব্যর্থ হলেন। আবু আলক্বামা সোজা মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করেন ও সেখানেই থেকে যান ও পরে শহীদ হন। অতঃপর প্রতিনিধিদল গোত্রের গীর্জায় পৌঁছে গেলে সেখানকার পাদ্রী সবকিছু শুনে ইসলাম কবুলের জন্য তখনই মদীনায় রওনা হতে চাইলেন। তিনি গীর্জার দোতলায় তার কক্ষ হতে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকেন, আমাকে এখুনি নামতে দাও। নইলে আমি এখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জীবন বিসর্জন দেব।

পরে লোকেরা তাকে নামতে দিল। তিনি একটি পেয়ালা, একটি লাঠি ও একটি চাদর রাসূলুল্লাহ সা.-এর জন্য হাদিয়াস্বরূপ নিয়ে তখনই মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। তিনি ইসলাম কবুল করার পর বেশ কিছু দিন মদীনায় অবস্থান করেন। অতঃপর রাসূল অনুমতি নিয়ে নাজরান ফিরে

আসেন। তাঁর দেওয়া উপঢৌকন আব্বাসী খলীফাদের সময় পর্যন্ত রক্ষিত ছিল।

প্রথম প্রতিনিধিদলটি ফিরে আসার অল্প দিনের মধ্যেই ৬০ জন আরোহীর একটি বিরাট প্রতিনিধিদল নিয়ে স্বয়ং বিশপ আবুল হারেছ অথবা আবু হারেছাহ বিন আলক্বামা রাসূল (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হন। তার সঙ্গে ১৪ জন নেতার মধ্যে সর্বোচ্চ তিনি-সহ আরও দু'জন ছিলেন। যাদের একজন হলেন নাজরানের শাসক (عَاقِبٌ) আব্দুল মাসীহ এবং প্রধান বিচারপতি ও প্রশাসক (سَيِّدُ) আইহাম (الْأَيْهَم) অথবা শুরাহবীল। ইনি সামাজিক ও আর্থিক বিষয়াদিও দেখাশোনা করতেন।

নবীজীর সা. দরবারে বহুধর্মীয় পারস্পরিক বিতর্ক

সম্ভবত দিনটা রবিবার ছিল। আছরের সময় মদীনায় পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ের অনুমতি দেন। তারা সেখানে প্রবেশ করে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করেন। কিছু মুসলমান তাদেরকে বাধা দিতে চাইলে রাসূল সা. নিষেধ করেন। খ্রিষ্টানদের এই বিরাট দলটি মদীনায় উপস্থিত হওয়ায় কিছু ইহুদি এসে তাদের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে বিতর্কে লিপ্ত হতো। একদিন তারা এসে বলল, ইবরাহিম আ. ইহুদি ছিলেন। জওয়াবে খ্রিষ্টান নেতারা বললেন, ইবরাহিম আ. খ্রিষ্টান ছিলেন। তখন সূরা আলে ইমরান ৬৫-৬৮ আয়াতগুলো নাজিল হয়। যেখানে বলা হয় যে,

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا﴾

ইবরাহিম না ইহুদি ছিলেন, না নাছারা ছিলেন। বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। আরেকদিন তারা এসে খ্রিষ্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলল, তোমাদের এই নবী কি চান যে, আমরা তার ইবাদত করি, যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসার পূজা করে থাকে? তখন এর প্রতিবাদে সূরা আলে ইমরানের ৭৯ ও ৮০ আয়াত দু'টি নাজিল হয়।

﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللهِ وَلَـكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ○ وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾

"এটা কোন মানুষের জন্য বিধেয় নয় যে, তাকে আল্লাহ কিতাব, হিকমত ও নবুওয়ত প্রদান করেন, অতঃপর সে লোকদের বলে যে, তোমরা সবাই আল্লাহকে ছেড়ে আমার গোলাম হয়ে যাও। বরং একথা বলবে যে, তোমরা সবাই আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। এটা এজন্য যে, তোমরা মানুষকে কিতাব শিক্ষা দিয়ে থাক এবং তোমরা তা পাঠ করে থাক।"

চরিত্রের কাছে নাজরোনবাসীর বশ্যতা স্বীকার

অতঃপর প্রতিনিধিদল বিদায় গ্রহণকালে রাসূল সা.-এর নিকটে আরয করেন যে, তাদের নিকট থেকে চুক্তির মালামাল আদায়ের জন্য একজন আমানতদার ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হোক। নবীয়ে কারীম সা.আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রা.-কে এ দায়িত্ব প্রদান করেন এবং বলেন,

«هَذَا أَمِيْنُ هَذِهِ الْأُمَّة»

"ইনি হলেন এই উম্মতের আমীন অর্থাৎ সবচেয়ে বড় আমানতদার ব্যক্তি"।

পরে আবু ওবায়দাহর সর্বোত্তম আমানতদারী, অনুপম চরিত্র ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে নাজরানবাসী দলে দলে মুসলমান হতে থাকেন। স্বয়ং 'আক্বেব' (শাসক) ও 'সাইয়েদ' (প্রধান বিচারপতি) মুসলমান হয়ে যান। যারা আগে কোনোভাবেই মুসলমান হতে রাজি ছিলেন না। আলী রা. কেও নাজরানে পাঠান প্রিয়নবী সা.। তাদের দাওয়াত ও চারিত্রিক অনুপমতায় মুগ্ধ হয়ে ধীরে ধীরে সমস্ত নাজরানবাসী মুসলমান হয়ে যায়।

মুশরিকদের সাথে ধর্মতাত্ত্বিক সংলাপ ও দাওয়াত

ইমরান ইবনে হুসাইনের বর্ণনা। প্রিয়নবী সা. আমার পিতাকে বললেন,

«يا حصين كم تعبد اليوم إلهاً؟»

"হে হুসাইন! তুমি আজ কয়জনের ইবাদত করলে?"

হুসাইন উত্তর করলেন,

«سبعة؛ ستة في الأرض، وواحدا في السماء»

"সাতজনের ছয়জন যমীনে আর একজন আসমানে।"

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«فَأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟»

"তোমার আবেগ ও ভীতির জন্য কাকে মাবুদ গণ্য করো?"

উত্তরে হুসাইন বলেন,

«الَّذِي فِي السَّمَاءِ»

'যিনি আসমানে আছেন।'

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«يَا حُصَيْنُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِك»

"হে হুসাইন! তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো তবে আমি তোমাকে এমন দুটি কালেমা শিক্ষা দেবো, যা তোমার উপকারে আসবে।"

তারপর যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন,

«يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِيَ الكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَعَدْتَنِي»

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে যে দুটি কালেমা শেখানোর ওয়াদা করেছেন, সে দুটি শিক্ষা দিন।"

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي ، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي»

"বলো, হে আল্লাহ! সঠিক পথের দিশা আমার মনে ঢেলে দিন এবং আমাকে আমার অন্তরের অকল্যাণ থেকে বাঁচান।"

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"হে কুরাইশ সম্প্রদায়! নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদতে কোনো কল্যাণ নেই। কিন্তু কুরাইশগণ জানত যে, খ্রিষ্টানগণ ঈসা আ.-এর ইবাদত করে। সুতরাং মুহাম্মাদ সম্পর্কে তুমি কি বলবে? তারা মুহাম্মাদ সা. কে উদ্দেশ্য করে বলল, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, ঈসা নবী ছিলেন এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের মধ্যে একজন ছিলেন? যদি তোমার কথায় সত্য হও তাহলে তাদের ইলাহও তো তোমাদের বক্তব্য মতো হওয়া উচিত।"

তখন কুরআনে ইরশাদ হলো,

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ○ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ○ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ○﴾

"যখন মারইয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন আপনার সম্প্রদায় তাতে শোরগোল শুরু করে দেয় এবং আপনাকে বলে উপাস্যগুলো শ্রেষ্ঠ না ঈসা? এরা শুধু বাক্‌বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই আপনাকে এ কথা বলে। বস্তুত এরা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়। তিনি তো ছিলেন আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বনী ইসরাইলের জন্য দৃষ্টান্ত।"

তোমার ধর্ম সম্বন্ধে আমি তোমার চেয়ে অধিক জানি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদী ইবনে হাতিমের সাথে তাঁর খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁকে যুক্তিতে পরাস্ত করে আল্লাহর দ্বীন মানতে উদ্বুদ্ধ করেন। যার ফলশ্রুতিতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

আদী ইবনে হাতিম বলেন, যখন আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন, তখন তাঁকে এমন প্রচণ্ড আকারে ঘৃণা করলাম (আদি ইবনে হাতিমের ভাষায়)—

«فَكَرِهْتُهُ أَشَدَّ مَا كَرِهْتُ شَيْئًا قَطُّ»

এবং তাঁর থেকে পালিয়ে যমীনের একপ্রান্ত রোমের পার্শ্বস্থ আরব ভূমিতে আশ্রয় নিলাম। তারপর আমি আমার প্রথম স্থানের চেয়েও সে স্থানে আবস্থান করাটাকে অত্যধিক অপছন্দ করলাম।

মনে মনে বললাম, আমি যদি লোকটির কাছে যেতাম এবং তাঁর কাছ থেকে কিছু শুনতাম তাহলে কেমন হতো? তারপর আমি মদীনায় এলাম। মানুষের মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে পড়ল। তারা বলাবলি করতে লাগল যে, আদী ইবনে হাতিম আত-তায়ী এসেছে।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«يَا عَدِيُّ بْنَ حَاتِمٍ , أَسْلِمْ تَسْلَمْ»

"হে আদী! তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, তাহলে নিরাপত্তা পাবে।"

আমি বললাম,

«إِنِّي مِنْ أَهْلِ دِينٍ»

"আমি একটি দ্বীনের উপর আছি।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ بِدِينِكَ»

"তোমার দ্বীন সম্পর্কে আমি তোমার থেকেও অধিক জ্ঞাত।"

আমি বললাম,

«أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنِّي»

"আপনি কি সত্যিই আমার দ্বীন সম্পর্কে আমার চেয়েও অধিক জ্ঞাত?"

তিনি বললেন,

«نَعَمْ، أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ»

"হ্যাঁ, তোমার ধর্ম সম্পর্কে তোমার চেয়েও আমি অধিক জানি।"

আদী ইবনে হাতেম বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটি তিনবার উচ্চারণ করেছিলেন। তারপর প্রিয়নবী সা. বললেন,

«أَلَسْتَ رَكُوسِيًّا؟»

"তুমি কি 'রুকুচী' নও?"

(অর্থাৎ এমন সম্প্রদায় যারা খ্রিষ্টান ও সাবেয়ি–এ দু-ধরনের ধর্মের মধ্যপন্থার অনুসারী)। আমি বললাম,

«بَلَى»

"অবশ্যই।"

তিনি বললেন, «أَوَلَسْتَ تَرْأَسُ قَوْمَكَ؟»

"তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দাও না?"

আমি বললাম, «بَلَى»

"হ্যাঁ।"

তিনি প্রশ্ন করলেন,

«أَوَلَسْتَ تَأْخُذُ الْمِرْبَاعَ»

"তুমি কি লুটের সম্পদের চারভাগে একভাগ নাও না।"

আমি বললাম, «بَلَى»

"নিশ্চয়ই।"

তিনি বললেন, «ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ فِي دِينِكَ» "কিন্তু এটা তো তোমার ধর্মমতে অবৈধ।"

আদী ইবনে হাতিম বলেন, «فَتَوَاضَعْتُ مِنْ نَفْسِي» "এতে আমার মন খারাপ হয়ে গেল।" তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«يَا عَدِيُّ بْنَ حَاتِمٍ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، فَإِنِّي مَا أَظُنُّ أَوْ أَحْسَبُ أَنَّهُ يَمْنَعُكَ مِنْ أَنْ تُسْلِمَ إِلَّا خَصَاصَةُ مَنْ تَرَى حَوْلِي»

"হে আদি ইবনে হাতিম, ইসলাম গ্রহণ করো, নিরাপত্তা লাভ করো। এটাই সম্ভবত তোমাকে আমাদের দ্বীন থেকে দূরে রেখেছে যে, তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, আমাদের এখানে অভাব-অনটন রয়েছে।"

এরপর দীর্ঘ ভবিষ্যদ্বাণী করেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আদি ইবনে হাতিম রা. মুসলমান হয়ে যান।

ধারণ করতে হবে এই আলো

এই যে নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা, একজন খ্রিষ্টানকে বলছেন আমি তোমার ধর্ম সম্পর্কে তোমার চেয়ে বেশি জানি, এটা নববী দাওয়াতের অনুসারীদের অন্তত একটি জামাতকে ধারণ করতে হবে। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব আজকের বিশ্ববাস্তবতায় মুসলিমদেরকে এ শিক্ষার অনুবর্তী বানাতে পারে। প্রত্যেক জাতি ও ধর্মের প্রচারক ও বিশেষজ্ঞদের একটি দল এখন এ শিক্ষাকে যার যার মতো করে অনুসরণের প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে। দুঃখের বিষয়, মুসলিমরা এ প্রতিযোগিতায় খুবই পিছিয়ে আছে।

ব্যক্তিগতভাবে খুবই সম্মানজনক ও গৌরবময় কিছু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছিল, আছে। যেমন আল্লামা রহমতুল্লাহ কিরানাভী রহ, শায়খ আবু যুহরাহ রহ, আহমদ দীদাত রহ., মুনশি মেহেরউল্লাহ রহ., জাকির নায়েক প্রমুখ। ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে জাতিগতভাবে মুসলিমদের মধ্যে এ জায়গায়

কাজের লোক অনেক কম। গবেষণার লোক অনেক কম। অগ্রসর ও নিবেদিত লোক অনেক কম। যদিও মুসলিমরাই এই ধারার উদ্বোধক।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঈকে যে এলাকায় পাঠাতেন, তিনি হতেন সেই এলাকার ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পারদর্শী। স্থানীয় ভাষায় তিনি কথা বলতে পারতেন। জানতেন সেখানকার জীবন, সংস্কৃতি, বাস্তবতা ও পরিবেশ-প্রতিবেশ। অনেকে লেখেছেন, এমনকি সুয়ুতীও লেখেছেন, দাঈদের এ যোগ্যতা লাভ ছিল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজেযা। যাঁকে যেখানে পাঠানো হতো, তিনি সেখানকার ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় পারদর্শী প্রমাণিত হতেন। সেখানকার রাজনীতিক, শাসক, পুরোহিত–সবাইকে ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে আকর্ষিত, মুগ্ধ, লা-জবাব, এমনকি অনুসারী করে নিতেন। বিতর্কের প্রয়োজনে করতেন বিতর্ক, যেখানে দরকার সুস্থির সংলাপ, সেখানে তাই করতেন।

এই যে গুণ, এটা ছিল প্রশিক্ষণের ফসল। আর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উম্মী মানুষগুলোকে জ্ঞান-প্রজ্ঞার এতো উঁচু অবস্থানে নিয়ে যাওয়া ছিল প্রিয়নবীর মুজেযা। কিন্তু সেই যে প্রশিক্ষণ, এখন খ্রিষ্টানরা তা অনুসরণ করছে। যেখানে যাদেরকে মিশনারি কাজে পাঠায় তাদের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতিতে পারদর্শী করে তারপর পাঠায়। ইসলামের সৌন্দর্যগুলো তারা কৌশলে ধারণ করার চেষ্টায় সর্বদা রত আছে। এটা করে করে তারা কেবলই এগিয়েছে, এগোচ্ছে। কিন্তু আমাদের জন্য নবীজির দাওয়াতি পদ্ধতি কি অনুসরণীয় নয়? তিনি কৌশলগত দাওয়াতের মাধ্যমে গোত্রের পর গোত্রকে আলোর সীমানায় নিয়ে এসেছেন। রাজা-বাদশাদের অনুকূলে নিয়ে এসেছেন। সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য জয়ের দরজা খুলে দিয়েছেন।

সাহাবায়ে কেরাম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন। একেকজন এমন দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন যে একেকটা রাজ্যের সকল জ্ঞানীর জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্নের মোকাবেলায় একজন যথেষ্ট ছিলেন। সেই ধারাকেই পরবর্তীরা অনুসরণ করেছে। কিন্তু আমাদের কী অবস্থা? আমাদের জন্য কি এটা অনুসরণীয় নয়? অবস্থা দেখে তো মনে হয় না, আমরা এ পথে এগোতে চাই। আপনারা কি এগোতে চান? আপনারা কি প্রস্তুত আছেন?

পাঠকের পাতা...

তাঁকে বললাম, 'স্যার টমাস আর্নল্ড ও আলফ্রেড গিয়োম সম্পাদিত "*The Legacy of Islam*" বইটি পড়বেন। এর আট নম্বর প্রবন্ধ হচ্ছে দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব, লেখেছেন পশ্চিমা দুনিয়ার অন্যতম ধর্মতাত্ত্বিক, ওরিয়েন্টালিস্ট আলফ্রেড গিয়োম। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন, ইউরোপের ইতিহাসে কম্পারেটিভ রিলিজিওনের ওপর সর্বপ্রথম বইটি লেখেন ইবনে হাযম। তিনি ইবনে হাযমকে "বেয়াড়া পণ্ডিত" বলেছেন। আবার এটা না বলে পারেননি যে, তিনিই ব্যাপকতামূলক তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞান এবং ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম ধারাবাহিক উচ্চাঙ্গের সমালোচনাগ্রন্থ লেখেন।

এর মানে, বাইবেলের ওল্ড ও নিউটেস্টামেন্ট নিয়ে তুলনামূলক উচ্চাঙ্গের আলোচনার প্রথম কৃতিত্বটা কোনো বাইবেল অনুসারীর নয়, খ্রিষ্টানের নয়, সেটা একজন বেয়াড়া মুসলিম পণ্ডিতের। মুসলিমরা ইসলাম তো বটেই, অন্যসব ধর্মের আলোচনা-পর্যালোচনায়ও শিক্ষকের ভূমিকায় ছিলেন। যেমন ইবনে হাযম হলেন তুলনামূলক ধর্ম ও বাইবেলের উচ্চাঙ্গ আলোচনায় ইউরোপের শিক্ষক। এবং মজার বিষয় হলো, ইবনুল হাযম ছিলেন মাদরাসার ছাত্র, মাদরাসারই শিক্ষক।

আমন্ত্রণ
প্রকাশন
9 789843 478016